প্রথম প্রকাশ ঃ ১ মে, ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ তন্দ্রা চক্রবর্তী
নাট্যচিন্তা, ৩৮/৫৭-এ মীনাপাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ ঃ অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক ঃ বেঙ্গল লোকমত প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
৪৮বি শাঁখারীটোলা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

পরিবেশনা ঃ পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তর
ঘটেছে যাঁদের হাতে
তাঁদের স্মরণ করে

রথীন চক্রবর্তীর বই

লাতিন আমেরিকার কবিতা

SWADESHI AND BOYCOTT

কার্ল মার্ক্সের সাহিত্য সংগ্রহ

গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র

ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম

রাজনৈতিক আন্দোলন, সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট

ভারতের বামপন্থী আন্দোলন

কবিতায় বিদ্রোহের ছায়াপথ

রমাঁ রলাঁর পিপলস থিয়েটার

বাংলা নাট্য আন্দোলন : গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার

মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তর

ভূমিকা

ইতিহাসবিদরা বলেন, বহু বছর আগে ভারতভূমি থেকে যে-বিশাল জনগোষ্ঠী রওনা হয়েছিলেন উত্তরার্ধের দিকে, পরবর্তীকালে তাঁরাই পরিচিত হন জিপসি নামাঙ্কনে রাশিয়ার নাগরিক হিসেবে, আজ যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি। তারপর ১৭৮৭ সালে রুশভূমি থেকে এদেশে আসেন গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ, যাঁর হাতে জন্ম নেয় বাংলা থিয়েটার। এইভাবেই ভারতবর্ষ বা ভারত এবং রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে গড়ে ওঠে এক অপার বন্ধুত্ব, এক সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক, যার মধ্যে আছে রক্তের স্পন্দন।

রক্তের এই প্রবাহ ধমনীতে হিল্লোল তোলে ১৯১৭ সালের রুশ মহাবিপ্লবের ঘটনায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের ভাবনা-চিন্তায় তা আনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন, উদ্দীপিত করে বিপ্লবের আলোকে, ভাবনায় প্রোথিত করে যুক্তির বিকাশ। রুশ মহাবিপ্লব এদেশের

মানুষের মনে রোপণ করে এক স্বপ্নের বীজ, যে-স্বপ্ন প্রতিশ্রুতি দেয় অনাবিল মুক্তির, এক শোষণ-হীন সমাজের। বিশের দশক থেকেই এদেশের রাজনীতিতে, ভারতের মুক্তি আন্দোলনের চেহারা এক ভিন্নতর রঙে ফুটে উঠতে থাকে, যার বনিয়াদ গড়ার কাজে হাত মেলায় এদেশের শ্রমিক-কৃষক, মেহনতী মানুষ। স্বাধীনতা-উত্তর ভারত আজও হিল্লোলিত সেই উত্তর আকাশের তারায়।

কিন্তু চোখের আড়ালে সব থেকে বড পরিবর্তনকে বহন করে বাংলা সংবাদপত্র। বাংলা সংবাদপত্রের চরিত্র, কাঠামোতে এসে লাগে বিপ্লবের ঝড। বাংলা সংবাদপত্র এর আগে যতটা চালিত ছিল আবেগে, তার থেকেও বেশি স্থিতধী হয়ে পড়ে সে ; যতটা ছিল ক্রোধ, তার থেকেও বেশি হয়ে পডে জঙ্গী ; যতটা সে ছিল ঘটনা-নির্ভর, তার থেকে অনেক বেশি চলে আসে মানুষের কাছাকাছি। সব থেকে বডো কথা, বাংলা সংবাদপত্রের এক ব্যাপক অংশ হয়ে পড়ে নির্দিষ্ট আদর্শ-ভিত্তিক, যে আদর্শ মানুষকে আলোকিত করার কথা বলে, যে আদর্শ মানুষের অবস্থানে উত্তরণ ঘটায়, যে-আদর্শ সংগ্রামের কথা বলে এবং সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এক সুস্থ জীবনে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। একটা নতুন ধারার সৃষ্টি হয় বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে, যে-ধারা আজও ইস্পাতের মতো তীক্ষ্ণ। কার্যত মহাবিপ্লবের হাতেই জন্মান্তর ঘটে বাংলা সংবাদপত্রের।

এই বোধ থেকেই এই গ্রন্থের উৎসার। কিছু কিছু বিষয় নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে, তবুও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত তথ্য ও ঘটনা যদি কিছু মানুষকেও এ নিয়ে ভাবতে সাহায্য করে তাহলেই বুঝবো এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি।

ডঃ রথীন চক্রবর্তী

মহাবিপ্লব ও বাংলা
সংবাদপত্রের জন্মান্তর

১.

প্রতিবাদী চরিত্রের উন্মেষ

সূচনা থেকেই বাংলা সংবাদপত্র এক প্রতিবাদী চরিত্রকে অবলম্বন করেছে তার অস্তিত্ব এবং প্রকাশে। ভারতে বৃটিশ শাসন নিশ্চয়ই তার প্রধানতম কারণ। কিন্তু কিছু অন্যতর যুক্তিও থেকে যায়। তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি এবং পট-পরিবর্তন, দেশের সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ ও বঞ্চনা, বিশাল জনপদের নিত্য হাহাকার এ দেশের কিছু শিক্ষিত মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীকে প্ররোচিত করেছিল প্রতিবাদে মুখর হতে। সঙ্গত কারণেই তাঁদের এই প্রতিবাদ প্রকাশের মাধ্যম হয়েছিল সংবাদপত্র। কিন্তু এই সব সংবাদপত্র যে বৃটিশ শাসনের পক্ষে খুব একটা স্বস্তির হয়নি তা বোঝা যায় ১৮২৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আইন বা অ্যাডামস রেগুলেশন প্রবর্তনের ঘটনায়। কলকাতার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা (চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ)[১] এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৮৩৫ সালে অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

কিন্তু সমগ্র পারিস্থিতিকেই পাল্টে দিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। কার্ল মার্ক্স যাকে অভিহিত করেছেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে। সিপাহী বিদ্রোহকে নিছকই হিন্দু সিপাহীদের ধর্মরক্ষার জন্য বিদ্রোহ বলে এক বিকৃত ব্যাখ্যার চেষ্টা চলেছে বেশ কিছুদিন ধরে। কিন্তু ইদানীং কালের যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ কার্ল মার্ক্সের তত্ত্বকেই[২] সমর্থন করেছে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য জুলুম দেশের সাধারণ মানুষকে সহ্যের শেষ সীমানায় নিয়ে যায়। তার আগেই, পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই নীলকরদের অত্যাচার গ্রামের মানুষ এবং রায়তদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। ১৮৫৪-তে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখা দেয় বিদ্রোহ। ১৮৫৩ সালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার প্রকাশ সেই উত্তাল সামাজিক পরিস্থিতিরই একটি বুদ্ধিজীবীগত বিস্ফোরণ। "এই পত্রিকার প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে দেশের স্বার্থ এবং যে সমুদয় রাজনৈতিক ও সামাজিক কুব্যবস্থা দেশের বর্তমান দুর্দশার কারণ, নিরপেক্ষভাবে তাহার বিচার ও প্রচার করা।"[৩] কোনো কোনো গবেষক অবশ্য বলছেন, প্রথম দিকে তাঁর হরিশচন্দ্র যুক্ত থাকলেও হিন্দু প্যাট্রিয়ট তাঁর একক দায়িত্বে প্রকাশিত হতে থাকে ১৮৫৫ সাল থেকে।[৪] ১৮৫৭ সালের মহা-বিদ্রোহ এবং ১৮৬০-এর নীলবিদ্রোহের সঙ্গে হিন্দু প্যাট্রিয়ট যুক্ত হয়ে পড়ে গভীরভাবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সিপাহী বিদ্রোহের উৎসকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার আবরণ দেবার একটা চেষ্টা চলে এসেছে। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই স্বীকার করবেন, এদেশে পা দেবার পর থেকেই ইংরেজরা সুচতুরভাবে যে-অভিযান চালায় তা হলো এদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে দেওয়া। ভারতকে শুধুমাত্র কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করা এবং ভারতের কৃষি থেকে ব্যাপক রাজস্ব সংগ্রহ করা ছাড়া প্রাথমিকভাবে বৃটেনের অন্য কোনো কর্মসূচী তখন ছিল না। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে দেশের কোটি কোটি কৃষিজীবী মানুষকে চরম শোষণের দিকে ঠেলে দেয় ইংরেজরা এবং জন্ম দেয় জমিদার শ্রেণীর। পাশাপাশি ধ্বংস করা হয় এদেশের কুটির শিল্পকে। টমাস লো লিখছেন, 'ধ্বংস, ধ্বংস, আর ধ্বংস। সর্বত্র ধ্বংস আর দারিদ্র্য। সমস্ত দেশ যেন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছে।'[৫] কার্যত, '১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত এই দীর্ঘ একশ বছরের

ইতিহাস আসলে ধ্বংস এবং লুণ্ঠনের ইতিহাস।'[৬] প্রকৃত অর্থে এটাই সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম উৎসস্থল, কারণ এই পরিস্থিতি যে-বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল সেটাই ছিল মহাবিদ্রোহের পটভূমি।

সংবাদপত্রে সিপাহী বিদ্রোহ উঠে এসেছে নানাভাবে। বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে হিন্দু প্যাট্রিয়টে হরিশচন্দ্র লিখেছেন, 'The disease seemed to have disappeared, when its symptoms broke out afresh, and in their indications showed that it was neither the fat of oxen nor the dread of proselytism but a deep-rooted cause of estrangement that led to these mutinous outbreaks.'[৭]

এবং আরও স্পষ্টভাবে : the sepoys began to fear not only for their caste and their pay, but like wise for their lands. They struck the first blow. The feudal aristocrates urged them on. When a certain measure of progress was made, that aristocracy put itself at the head of the movement, and the sepoy mutiny became the Indian rebellion.[৮] এক কথায় : It is no longer mutiny, but a rebellion.[৯]

এবং সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপকতা সম্পর্কে : All the cartidges in the stores of Bengal may be burned before the eyes of the men, yet they will not cease to murmur. The disaffection is too deep-rooted to be removed by such means. এবং একই সঙ্গে ; English Statesmanship may secure our property; increase our wealth, multiply our comfort, strew the country with palaces and with plenty to fill them. But man does not live by bread alone.[১০] বস্তুতপক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সরাসরি বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতার দাবি প্রথম রেখেছিল হিন্দু প্যাট্রিয়ট, এবং সেটা ১৮৫৮ সালেই। (বিশিষ্ট ইংরেজ প্রাবন্ধিক পি লোভেট তাঁর 'জার্নালিজম ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের সময় থেকেই না-কি ভারতবর্ষে প্রকৃত সাংবাদিকতার সূচনা হয়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রকৃত গণসংগ্রামকে চিরদিনই এঁরা কিছুটা আতঙ্কিত হয়েই ছোট করে দেখার চেষ্টা করেছেন।)

মহাবিদ্রোহের পর এদেশের উপনিবেশ পর্বে দ্বিতীয় যে ঘটনাটি আলোড়ন সৃষ্টি করে তা হলো নীলবিদ্রোহ। সারা বাংলাদেশে কম করেও ষাট লক্ষ কৃষক এই নীলবিদ্রোহে যোগদান করেছিল। জেমস লঙের মতে নীলবিদ্রোহের মূল কারণ হলো, ১) জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, ২) শ্রমের মূল্যবৃদ্ধি, ৩) কৃষকদের প্রতি মধ্যবিত্তের সহানুভূতি, ৪) আধুনিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীসঞ্জাত রাজনৈতিক উত্তেজনা। শেষের কারণটির মাধ্যমে সম্ভবত লঙ্ সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের কথাই উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন।[১১]

নীলবিদ্রোহে হরিশচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে যেমন নীল চাষীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তেমনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হিন্দু প্যাট্রিয়ট এক অসামান্য ভূমিকা পালন করে। নীলকরদের অত্যাচারের খবর সংবাদপত্রের পাতায় ধরে রাখতে গ্রামে গ্রামে সাংবাদিক বাহিনীও গঠন করেছিল এই পত্রিকা। নীল চাষ এবং নীল আন্দোলন সম্পর্কে একাধিক তথ্যমূলক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। হরিশচন্দ্র লেখেন : Let us see what the system really is. We lay aside exceptional cases. A lease for a long term or for perpetuity is taken, factory and workers are established with money advanced by a Calcutta firm of merchants. The ryots are called on to grow indigo for the factory, each according to his resources in agricultural implements and the quality and capacity of the landlords he hold, and for that purpose are made to take advances of money to be repaid in produce in kind at a price fixed at that time ... . The business of the factory, it will be observed, is confined to manufacturing the raw produce into the saleable drug and to send it down to Calcutta for sale.[১২] শোষণ পদ্ধতির এই স্বরূপ জানিয়ে হরিশচন্দ্র লেখেন : To the most ignorant reader, the facilities which such a system affords for fraud and oppression would be apparent. It is fraud and oppression from beginning to end.[১৩] কার্যত হরিশচন্দ্র সেই সময়ে এদেশের কৃষকদের অবস্থাকে উত্তর আমেরিকার দাসদের সঙ্গে এবং কৃষক আন্দোলনকে বৃটেনের ধর্মঘটের সঙ্গে তুলনা করেন। ইংরেজরা রায়তদের ওপর কী ধরণের দৈহিক অত্যাচার চালিয়েছে তারও

অঞ্চল-ওয়ারি রিপোর্ট প্রকাশ করে হিন্দু প্যাট্রিয়ট। এইসব কারণে এক সময়ে হরিশচন্দ্রকে আদালতেও দাঁড়াতে হয়। হরিশচন্দ্রের আকস্মিক প্রয়াণ সংবাদপত্রের এক দৃপ্ত ইতিহাসে ছায়াপাত ঘনিয়ে আনে।

হরিশচন্দ্র ও হিন্দু প্যাট্রিয়টের ভূমিকা সম্পর্কে দ্বিমত আছে। হিন্দু প্যাট্রিয়ট লর্ড ডালহৌসিকে পছন্দ করতো না, কিন্তু লর্ড ক্যানিংকে সমর্থন করতো, বা হিন্দু প্যাট্রিয়ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ছিল, বা হরিশচন্দ্র আসলে চেয়েছিলেন ইংরেজ থাকুক কিন্তু তার প্রশাসনিক চেহারা আরও নম্র হোক—এই ধরণের অভিমতও অনেকে পোষণ করেন। হিন্দু প্যাট্রিয়টের অনেক লেখাতেও এই ধরণের দোদুল্যমানতা স্পষ্ট। কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে, হিন্দু প্যাট্রিয়ট ছিল মূলত জাতীয়তাবাদী এবং তার বিষয় ছিল এদেশের সাধারণ মানুষ। সুপ্রকাশ রায় অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেন যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ছিলেন সমাজ সংস্কারক, কিন্তু হরিশচন্দ্র ছিলেন একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৮৬১) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন, আমরা সম্প্রতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করতে শিখেছি। আর হরিশচন্দ্র মুখার্জি ছিলেন সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণস্বরূপ (Mukherjee's Magazine)। বাস্তবিক পক্ষেই হিন্দু প্যাট্রিয়ট জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী চেতনার এবং স্বাধীনতাবোধের জন্ম দিয়েছিল।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট বাংলা সংবাদপত্র নয়। কিন্তু বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসের সঙ্গে তার বন্ধন অচ্ছেদ্য। ১৮৫৩-তে হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রকাশিত হবার পর ১৯০০ সালের মধ্যে বেশ কিছু বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যের একটা তালিকা এরকম হতে পারে :

১৮৫২ : সমাচার সুধাবর্ষণ (সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন)
সংবাদ ভাস্কর (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য)

১৮৫৫ : বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (কালীপ্রসন্ন সিংহ)
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা (নারায়ণ চন্দ্র আঢ্য)

১৮৫৬ : অরুণোদয় (লালবিহারী দে)

১৮৫৮ : সোমপ্রকাশ (দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
সুবোধিনী (রামচন্দ্র দীক্ষিত)

১৮৬১ : ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র (তারকচন্দ্র চূড়ামণি)

পরিদর্শক (জগমোহন তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ)

সুধাকর (মথুরামোহন তর্কভূষণ)

১৮৬৩ : গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (হরিনাথ মজুমদার)

হিতসাধক (প্যারীচরণ সরকার)

১৮৬৮ : অমৃতবাজার পত্রিকা, সাপ্তাহিক (শিশিরকুমার ঘোষ)

১৮৭২ : বঙ্গদর্শন (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

১৮৭৪ : ভারত শ্রমজীবী (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

১৮০৭ : ভারতী (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৮৭৮ : আনন্দবাজার পত্রিকা, সাপ্তাহিক

১৮৮০ : পরিদর্শক (বিপিনচন্দ্র পাল)

১৮৮১ : বঙ্গবাসী (জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়)

১৮৮৩ : সঞ্জীবনী (দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রমুখ)

১৮৮৪ : নবজীবন (অক্ষয়চন্দ্র সরকার)

১৮৮৫ : দৈনিক (কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

১৮৯০ : জন্মভূমি (পঞ্চানন তর্কালঙ্কার)

১৮৯১ : সাধনা (সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরে রবীন্দ্রনাথ)

১৮৯৬ : বসুমতী, সাপ্তাহিক (ব্যোমকেশ মুস্তাফি)

১৯০০ : প্রবাসী (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)

এই সময়ের সংবাদপত্রগুলির চরিত্র ছিল বহুমুখী। প্রাথমিকভাবে হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক হলেও, শিক্ষা প্রসার, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয় প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক সচেতনতাও পরিস্ফুট হয়। কিছু কিছু সংবাদপত্র ইংরেজ শাসনকে 'ত্রাতা' বলে মনে করলেও অধিকাংশের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী কণ্ঠস্বর ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিন্দি এবং বাংলায় দ্বিভাষিক পত্রিকা দৈনিক সমাচার সুধাবর্ষণে ব্যবসা বাণিজ্য প্রাধান্য পেলেও উল্লেখযোগ্য খবরাখবর থাকতো এবং ইংরেজের আর্থিক নীতি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত রাখতো। বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সভ্যতার বিষয় নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিল 'বাল্য বিবাহ' এবং 'বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা' সম্পর্কে আলোচনা। উল্লেখ্য, সিপাহী বিদ্রোহের সময় লর্ড

ক্যানিং-এর আমলে সংবাদপত্রের ওপর আবার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ১৮৫৭ সালের ১৩ জুন থেকে ১৮৫৮ সালের ১৩ জুন পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ বহাল ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার এবং রংপুরের রঙ্গপুর বার্তাবহ কাগজ দুটি বন্ধ হয়ে যায়।[১৪]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, সোমপ্রকাশ প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমতো আলোচনা প্রকৃতপক্ষে সোমপ্রকাশেই শুরু হয়। ...১৮৭৮ সনের মার্চ মাসে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি হয়। পর বৎসর ২৯ মার্চ তারিখের ক্যালকাটা গেজেটে সোমপ্রকাশের প্রতি রাজরোষের চিহ্ন প্রকাশ পায়। সোমপ্রকাশের লাহোরস্থ সংবাদদাতার পত্র প্রকাশ হওয়াতে গবর্ণমেন্ট সোমপ্রকাশের নিকট হইতে হাজার টাকা জমানৎ ও মুচলেকা চাহিয়া পাঠান। 'রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া যায়।' সোমপ্রকাশই লেখে, ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্রে রাজনীতি সংক্রান্ত নানা আলোচনা প্রকাশিত হয় যা দেশের মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিবিধার্থ সংগ্রহে লেখা হয়, দৈনিক পরিদর্শক একটি উপযুক্ত দৈনিকের অভাব মিটিয়েছে। সাধারণ মানুষের দিনযাপনের খবর এতে প্রাধান্য পেতো। গ্রামের খুঁটিনাটি খবর প্রথম উঠে আসে কাঙাল হরিনাথের গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়। 'ইহার অভ্যুদয়ে পূর্বে ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, তদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেন না।' হরিনাথ নিজে লিখেছেন: 'যখন গ্রামবার্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনাময় সম্বাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার অভিপ্রায় মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্মনীতি সাহিত্য ব্যতীত পূর্ববৎ আর সকলেরই প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল।'

অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ সম্পর্কে নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, 'তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এইদেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক', যদিও প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ইংরেজ ভক্তিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বার্থশূন্য, মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুররা আমাদের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে, এই অভিমত প্রকাশ করে বলা হয়েছিল, 'আমরা মনস্থ করিয়াছি, যে এদেশীয় ও ইউরোপীয়

বিবিধ সংবাদ, নূতন আইনের মর্ম, ব্রিটিশ ও এদেশস্থ অন্যান্য রাজ্যের শাসন প্রণালী ও তাহাদের পরস্পরের গুণাগুণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকটিত করিবে।' কিন্তু কিছুদিন বাদেই সম্পাদকীয়তে লেখা হলো, 'কর্তৃপক্ষকে প্রার্থনা করা আমাদের ভত উদ্দেশ্য নয়, আমাদের দেশীয়েরা কি রূপ অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কি রূপ হীনাবস্থায় আছেন, তাঁহারদিগকে দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা ফটগ্রাফার মাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক ফটগ্রাফ লইয়া আমরা এদেশীয়রদিগকে দেখাইয়া থাকি, যদি ফটগ্রাফি তুলিতে এরূপ ছবি উঠে যে, কেহ-২ অন্যের মুখের ভাত কাড়িয়া খাইতেছে ; বলবান দুর্ব্বলের গলা টিপিতেছে ; অভদ্র অপমান করিতেছে ; একজনের ন্যায্য সত্ত অন্যকে দেওয়া হইতেছে, বিচারক অবিচার করিতেছেন, তবে আমাদের হাত কি···সত্য কথা বলিতে যে ফল হউক না কেন, আমরা তদ্বিষয়ে একবার চিন্তাও করি না।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।' কার্যত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় সাহিত্য ছাড়াও কখনও চপলতায় কখনও বা বিদ্রূপে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজ-নীতি, বাংলার ইতিহাস, বাংলায় ইংরেজ শাসন, বাংলায় ইংরেজ শাসনে কৃষকদের অবস্থা, সাম্যবাদ ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক রচনা লেখেন। এসবের মধ্য দিয়ে বঙ্গদর্শন জাতীয়তাবাদের প্রসারে ব্রতী হয়েছিল। শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে এদেশের প্রথম পত্রিকা 'ভারত শ্রমজীবী'। সম্পাদক শশীপদ বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, 'সামান্য লোকদিগের জন্য আমাদের দেশে কোনো সচিত্র পত্রিকা নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্যে আমাদের মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়াতেই আমরা এই পত্রিকাখানি বাহির করিতে আরম্ভ করিলাম।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।' মোটামুটিভাবে 'ভারতী' পত্রিকার বিষয় সাহিত্য হলেও সমসাময়িক ঘটনার ওপর আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। সাপ্তাহিক বাংলা অমৃতবাজার ইংরেজিতে রূপান্তরিত হওয়ায় সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা সেই স্থান নিয়েছে—একথাই বলা হয়েছিল এই কাগজের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে। ফলে, সত্য ঘটনাকে হুবহু তুলে ধরার ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালন করেছিল আনন্দবাজার পত্রিকা। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদকীয় দায়িত্বের প্রথম সিঁড়ি ছিল সিলেট

থেকে প্রকাশিত 'পরিদর্শক' পত্রিকা। বিপিনচন্দ্র নিজেই লিখেছেন, এই পত্রিকা বাংলাদেশের শিক্ষিত জনমতের মুখপত্র হয়ে ওঠে। বঙ্গবাসী এবং সঞ্জীবনী সরাসরিই ঘোষণা করেছিল, রাজনীতিই হবে তাদের মূল আলোচ্য বিষয়। নবজীবন, দৈনিক এবং জন্মভূমির প্রকাশের মধ্যে সময়ের কিছু ব্যবধান থাকলেও চরিত্রের দিক থেকে এরা অনেকটাই সমধর্মী ছিল। মূলত, বাংলাদেশের সমকালীন জীবন-চর্চা, শিক্ষা বিস্তার, বাঙালীর ঐতিহ্য এবং প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এইসব কাগজে আলোচিত হয়েছে। সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয় রাজনীতিও ইহাতে থাকিবে, দেশের অভাব অভিযোগাদির কথাও থাকিবে। তদ্ভিন্ন ইতিহাস, দেশ-নগরাদির বিবরণ, চাষবাসের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, হিন্দুর পুরাতন মহিমার কথা; ধর্ম শাস্ত্রাদির কথা, উপন্যাস, রঙ্গরহস্য প্রভৃতি সুখপাঠ্য বিষয় থাকিবে।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' এবং এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' আলোচনার বিষয়ে এবং মানে এক নতুন উত্তরণ ঘটিয়েছিল বাংলা সাংবাদিকতার। প্রকৃতপক্ষে বাংলা পত্রপত্রিকায় 'সমাজতন্ত্র' কথাটির ব্যবহার, তার ব্যাখ্যা এবং সে সম্পর্কে কিছু ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা গেছে এই দুটি পত্রিকায়। যদিও 'সমাজতন্ত্র'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলা সংবাদপত্রে পড়তে শুরু করে ১৯০৫-এর পর থেকেই।[১৫]

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, বাংলা সংবাদপত্রের চরিত্রে ঋজুতা এবং প্রতিবাদী চেতনা সৃষ্টি করেছিল দুটি ঘটনা: ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ এবং ১৮৬০-এর নীলবিদ্রোহ। বিক্ষোভ-বিদ্রোহ এর পরেও অব্যাহত ছিল, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা সংবাদপত্র তার সঙ্গে কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কিন্তু এই পর্বের বাংলা সাংবাদিকতার মূল উৎস ছিল জাতীয়তাবাদ। ইংরেজকে সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার স্পর্ধা বাংলা সংবাদপত্রের সেদিন হয়নি, এবং সেটা হয়নি রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে না ওঠার জন্যেই। কিন্তু ইংরেজ শাসনকে অত্যাচারের শাসন এবং ইংরেজের উপস্থিতিকে অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করতে কিছু কিছু বাংলা সংবাদপত্র দ্বিধা বোধ করে নি। উপনিবেশবাদ সম্পর্কে বাংলা সংবাদপত্রের কাছে সেদিন কোনো সঠিক এবং বিজ্ঞাননির্ভর বিশ্লেষণ ছিল না, কিন্তু বিজাতীয় অনুপ্রবেশ

একটি দেশের জাতীয় সংস্কৃতি জাতীয় ঐতিহ্য এবং জাতীয় অর্থনীতিকে যে ধ্বংস করে দিতে পারে এই চেতনা তাদের ছিল। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পরিচালিত তদানীন্তন বাংলা সংবাদপত্রের জগৎ পশ্চিমের যুক্তিবাদী শিক্ষার আলোকে গ্রহণ করতে পিছ-পা হয় নি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমর্থনও করেছে। কিন্তু পশ্চিমের বিলাসী-সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাতেও কোনো সঙ্কোচ রাখে নি সে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কিছু কিছু সঙ্কীর্ণতা যে আসে নি তা-নয়, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্র এগুলিকে কাটিয়ে উঠেছে।

কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল এই কারণেই যে ১৮৪৮-এ ফ্রান্সের দ্বিতীয় বিপ্লব এবং গণপ্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ১৮৭১ সালে ফরাসী বিপ্লবীদের উদ্যোগে প্যারী কমিউনের প্রতিষ্ঠা, ওই সময়েই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের নেতৃত্বে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলন, ১৮৮৬-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমিক বিস্ফোরণ এবং শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি বৃটেনের ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে ম্যাঞ্চেস্টার পর্যন্ত ব্যাপক শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘট এবং শ্রমিক প্রতিরোধ—এ সমস্ত খবরাখবরই কোনো না কোনো সূত্রে ভারতে এসে পৌঁছোচ্ছিল। এগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করার ক্ষমতা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের ছিল না। আন্দোলন-শিহরিত পৃথিবী বাংলা সংবাদপত্রকে শুধু প্রতিবাদী চরিত্রই নয়, এক নতুনতর ভূমিকার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল।

২

জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী চেতনার বিকাশ

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্ চিন্মোহন সেহানবীশ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই নতুন দ্বারপ্রান্তে পৌঁছনোর ব্যাপারে কতগুলি উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান চালিয়েছেন। প্রথমত, ১৮৩০ সালে বৃটেনে যাবার পর রামমোহন রায়ের সঙ্গে বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী চিন্তাবিদ্ রবার্ট ওয়েনের পরিচয় হয়, সম্ভবত ১৮৩২ সালের শেষে অথবা ১৮৩৩ সালের গোড়ায়। সমাজতন্ত্রে ধর্মের স্থান কী বা কতটুকু তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। ওয়েনের চিন্তাভাবনায় রামমোহন যে যথেষ্ট চমৎকৃত হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওয়েনের ছেলে রবার্ট ডেল ওয়েনকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। দ্বিতীয়ত, ১৮৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এম এ পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল : কমিউনিজমের লক্ষ্য কী? ফ্যুরিয়ার এবং সেন্ট সাইমন যথাক্রমে যে প্রকল্প রচনা করেছিলেন তার বিবরণ দাও। তৃতীয়ত, ১৮৭১ সালে জন হান্টার তাঁর 'Indian Musalmans' বইতে ভারতীয় ওয়াহাবিদের চিহ্নিত করেছিলেন

Communists and Red-Republicans in politics বলে। চতুর্থত, ১৮৭৩ সালে ময়মনসিংহ জেলায় যে কৃষক আন্দোলন হয় তার নেতা টিপু পাগলাকে পূর্ববাংলার লুই ব্লাঁ নামে অভিহিত করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। পঞ্চমত, ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের ১৮৭১ সালের ১৫ আগস্ট তারিখের সাধারণ সংসদের এক সভার কার্য বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে যে কলকাতা থেকে একটি চিঠি তাঁরা পান। ওই চিঠিতে ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিকের একটি শাখা খোলার জন্যে অনুমতি চাওয়া হয়।[১৬] এই চিঠির লেখক সম্পর্কে অবশ্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি।

১৮৯১ সালে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় সাধনা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ওই বছরেই ওই পত্রিকায় ক্যাথলিক সোস্যালিজম নামে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোস্যালিস্ট নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। এতকাল এই সোস্যালিজম মত প্রায় নাস্তিকতার সহচর স্বরূপ ছিল। প্রায় সমস্ত সোস্যালিস্ট পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে।

১৮৯২ সালে সাধনায় সোস্যালিজম নামে আরেকটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন; সোস্যালিস্টরা চাহে যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোনো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ...ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেই জন্যই ধন সাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক—কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না। ...... সোস্যালিজম সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে মানবসমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।

চিন্মোহন সেহানবীশ এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক আর্নেস্ট বেলফোর্ট ব্যাক্সের মতামত সংক্ষেপে হাজির করেছেন।

১৮৮৬ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক ব্যাক্সের Religion of Socialism বইখানি খুব সম্ভব ঐ সময় নাগাদ পৌঁচেছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে।'[১৭]

আরও জানা যাচ্ছে, ১৮৯৩ সালের ১৩ নভেম্বর অরবিন্দ ঘোষ এক প্রবন্ধে লেখেন: নিম্নশ্রেণীর ক্ষমতা ও সভ্যতার ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার ঝোঁকের উপরেই নির্ভর করছে গোটা জাতির ভবিষ্যত।

এবং ১৮৯৩ সালের ৪ ডিসেম্বর আরেকটি প্রবন্ধে: আমাদের মধ্যে যারা প্রলেটারিয়েট তারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত এবং দুর্দশায় জর্জরিত। কিন্তু এখন যখন আন্তরিকতা, শক্তি ও বিচারবিবেচনার দিক থেকে মধ্যশ্রেণী অক্ষম প্রতিপন্ন হয়েছে তখন আমরা পছন্দ করি চাই না করি, ঐ দুর্দশাগ্রস্ত ও অজ্ঞ প্রলেটারিয়েটের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের আশার, আমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা।[১৮]

বিবেকানন্দ জীবনীগ্রন্থ লিখতে গিয়ে রমঁ্যা রলাঁ জানিয়েছেন যে ১৮৯৬ সালে বিবেকানন্দ ভগিনী ক্রিস্টিনকে বলেছিলেন: নবযুগের সূচনা ঘটবে যে অভ্যুত্থানে তা ঘটবে রাশিয়ায় অথবা চীনে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না কোথায়—তবে এ দুইয়ের মধ্যে একটিতেই। ... দুনিয়ায় এখন তৃতীয় যুগ চলেছে বৈশ্যদের আধিপত্যে। চতুর্থ যুগ হবে শূদ্রদের পরিচালনায়। ১৯০০ সালে বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাত হয় নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী ক্রপট-কিনের। পরবর্তীকালে I am a Socialist প্রবন্ধে বিবেকানন্দ লেখেন: দিন আসবে যখন প্রত্যেক দেশে শূদ্ররা তাদের সহজাত শূদ্র প্রকৃতি ও আচরণাদি সমেত···প্রতিটি সমাজেই পূর্ণ আধিপত্য লাভ করবে। ঐ নব শক্তির প্রত্যুষলগ্নের প্রথম রশ্মিগুলি ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ার উপরে·· সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নিহিলিজম এবং ওই ধরণের গোষ্ঠীগুলি আসন্ন সমাজবিপ্লবেরই অগ্রদূত।[১৯]

এই হলো সেই সময়ের বাংলার তথা ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলের ভাবনাচিন্তা। অন্যদিকে দেখা যাবে, ১৮৫৩ সালে বোম্বাইয়ে এবং ১৮৫৪ সালে বাংলায় স্থাপিত হলো রেলপথ। রেলপথকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে শিল্প। কিছুদিনের মধ্যেই বন্দরের সুযোগ ও অন্যান্য কারণে ইংরেজরা বোম্বাই-ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ইতিমধ্যে, মহাবিদ্রোহের পরেই, ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারত শাসনের ভার চলে

যায় বৃটিশ পার্লামেন্টের হাতে। বিভিন্ন শিল্পকে উৎস করে ভারতের বুকে জন্ম নিতে থাকে শ্রমিকশ্রেণী। মহাবিদ্রোহের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ হয়। বাংলাদেশের নীলবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মহারাষ্ট্রের কৃষক অভ্যুত্থান, মালাবারের মলাক্কা বিদ্রোহ ইত্যাদি প্রকারান্তরে চিহ্ন রেখে যায় কৃষকদের ওপর ইংরেজের অত্যাচারের। অসংখ্য কৃষক ছুটে আসতে থাকেন শহরের দিকে, শিল্পে কর্মসংস্থানের জন্য। সুপ্রকাশ রায় লিখছেন, ১৮৩০ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যে ক্রীতদাসপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর এই ভূমিহীন কৃষকদের এক বিরাট অংশ ভারত ত্যাগ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উপনিবেশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে জীবিকা উপার্জনের জন্য যায়। প্রকৃত-পক্ষে ১৮৩০ সাল থেকেই এই যাত্রা শুরু হয় এবং ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যেই ১৭,০০০ ভারতীয় শ্রমিককে মরিশাস ইত্যাদি দ্বীপে রপ্তানী করা হয়। এইভাবে দলে দলে দেশত্যাগের মধ্যে দিয়েই বলা যেতে পারে যে ভারতীয় ভূমিহীন কৃষকরা সর্বপ্রথম সংগঠিত শিল্পে স্থানান্তরিত হয়।[২০] এদেশের শিল্পগুলিকে কেন্দ্র করে এদেশে যে শ্রমিক সমাজ সৃষ্টি হয় তাতে মহিলা ও পুরুষ ছাড়া শিশুরাও ছিল। এবং এই পর্বে তাদের দৈনিক ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা খাটানো হতো। শ্রমিক দুর্দশা মোচনের কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকলেও ১৮৭৮ সালে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ ওয়ার্কিং মেনস মিশন প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮৪ সালে বোম্বাইয়ের মিল শ্রমিকদের সমস্যা তুলে ধরার জন্য এবং দাবি দাওয়ায় সোচ্চার হবার জন্য নারায়ণ মেঘাজী লোখাণ্ডে শ্রমিকদের একটি সভা আয়োজন করেন এবং ১৮৯০ সালে তিনি বোম্বাই মিলহ্যাণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেন। ১৮৮৪ সালের সভাতে যে দাবি সনদ তৈরি করেন শ্রমিকরা তাতে বলা হয়: রবিবার শ্রমিকদের পুরো ছুটি দিতে হবে, প্রতিদিন কাজের মধ্যে আধঘণ্টা বিশ্রাম চাই, কারখানায় কাজের সময় হবে সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত, মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মাইনে দিতে হবে ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, জর্মনী প্রভৃতি দেশে তখন আন্দোলন চলছে। বৃটেনে মাঝে মধ্যেই চলছে ধর্মঘট।

সব থেকে আশ্চর্যের ঘটনা হলো, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ১৮৬০-এ বাংলায় কৃষকদের নীলবিদ্রোহ এবং তারপর ১৮৬২-তেই ঘটে ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট, বাংলাদেশেরই হাওড়া স্টেশনে। দৈনিক আট

ঘণ্টা কাজের দাবিতে ১২০০ শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগ দেন। এবং এই ঘটনা ১৮৮৬ সালের ১ মে-র ঘটনার চব্বিশ বছর আগে। ১৮৬২-র ৫ মে তারিখে সোমপ্রকাশ পত্রিকা লেখে: সম্প্রতি হাবড়ার রেলওয়ে স্টেশনে প্রায় ১২০০ মজুর কর্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমোটিভ (গাড়ি) ডিপার্ট-মেন্টের মজুরেরা প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু তাহাদিগকে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য স্থগিত রহিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি মজুরদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন, নচেৎ লোক পাইবেন না।

১৮৮০ সালের পর থেকে ১৯০০ সাল, এই কুড়ি বছরে এদেশের বিভিন্ন শিল্পে যে শ্রমিক আন্দোলন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ১৮৮২-র শেষে সুরাটের গুলাম বাবা স্পিনিং মিলে পরপর ২বার ধর্মঘট, ১৮৮৭-তে কুর্লা স্বদেশী মিলে ধর্মঘট, বাংলার ঘুসুরী কটন মিলে ১৮৮৯ এবং ১৮৯০ সালে ধর্মঘট, ওয়ার্ধা হিঙ্গনঘাট মিলে চারবার ধর্মঘট, কোয়েম্বাটোর স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিলে ১৮৯১ সালে ধর্মঘট, মাদ্রাজের সাদার্ন ইণ্ডিয়া স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেডে পাঁচবার ধর্মঘট, বোম্বাইয়ের নাওরোসজী ওয়াদিয়া অ্যাণ্ড সন্স-এ ২বার ধর্মঘট, বোম্বাই-এর হীরামানেক অ্যাণ্ড কোম্পানির তিনটি মিলে ১৮৯২-তে ধর্মঘট, ১৮৯২ ও ৯৩ সালে বোম্বাইয়ের একাধিক মিলে একই সঙ্গে ধর্মঘট, ১৮৯৫ সালে আমেদাবাদের মিলগুলিতে ধর্মঘট, ১৮৯৫ ও ৯৬ সালে কলকাতার নিকটবর্তী বজবজে চটকলে ২বার ধর্মঘট, ১৮৯৯ সালে জি আই পি রেলওয়েতে ২৭ দিনের লাগাতার ধর্মঘট।[২১]

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, এক দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ভারতবর্ষ। বুদ্ধিজীবীদের আকাশে ভীড় করে আসছিল বহির্ভারতের নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নানা ভাবনাচিন্তা, বিশেষত সমাজতন্ত্র ও তার রূপ। অন্যদিকে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে জমাট বাঁধছিলো অসন্তোষ, গড়ে উঠছিল তাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য, এমন কি প্রয়াস চলছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই ঐক্য রচনা করার।

সংবাদপত্রে এই দুয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে। একের পর এক বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের কথা, তাদের ওপর অত্যা-চারের কথা, পাশাপাশি বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীর লেখায় ছায়াপাত ঘটেছে বৈষম্যহীন এক সমাজের বা দারিদ্র্য-বিমুক্ত এক দেশের কল্পনার। সন্দেহ নেই, এইসব সমাজবাদী ভাবনা পুরোপুরি মার্ক্সীয় ভাবনার আলোকে রচিত

হয়নি। মূলত ফেবিয়ান সোস্যালিজমই ছিল এর উৎস। কারণ ফেবিয়ান সোস্যালিজম ছিল মূলত ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক-চর্চা, যাঁরা উদারনীতিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেন। জর্জ বার্নার্ড শ, সিডনি ওয়েব, সিডনি অলিভিয়ের, গ্রাহাম ওয়ালেস প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের কথাবার্তা নানা সূত্রেই, বিশেষত বৃটিশ পত্র পত্রিকা মারফৎ এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু এরই সূত্র ধরে কিছুদিনের মধ্যেই আসতে শুরু করে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের কথা। এই ধারণা যে ভ্রান্ত নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন চিন্মোহন সেহানবীশ জানান যে তাঁর বন্ধু ডঃ জোয়ারভ তাঁকে জানিয়েছিলেন যে ১৮৯০ সালে বোম্বাইয়ে এক সভায় ফেবিয়ান সমাজবাদ নিয়ে আলোচনা হয় এবং তার মধ্যে কেউ প্রসঙ্গত কার্ল মার্ক্সের কথা উল্লেখ করেন। ১৯০০ সালে ডন পত্রিকায় সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন: The Indian Economic Problem. ওই প্রবন্ধে সতীশচন্দ্র উল্লেখ করেন ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের Condition of the working class in England in 1844 রচনাটির এবং বলেন এঙ্গেলসের এই রচনা পড়লেই 'শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণীর যে মানসিক অবনতি ও দুরাবস্থা ঘটেছিল তার সম্পর্কে আর কারো কোনো সংশয় থাকে না।'

অতঃপর ১৯০৩ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় উদ্ধৃত হয় বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ যার বিষয় ছিল বিশ্বের নানা দেশে সমাজতন্ত্রের বিস্তার। ওই প্রবন্ধে কার্ল মার্ক্সের উল্লেখ ছিল, যদিও তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো আলোচনা সেখানে ছিল না।

এদেশে সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের যে একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, এইসব ঘটনাই হলো তার প্রমাণ। সংবাদপত্রে সেই অভিব্যক্তিই ধরা পড়ে। এবং এই সময়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন মানুষদের স্বদেশে এবং বিদেশে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ' গ্রন্থে জানিয়েছেন ১৮৯২ সালে অরবিন্দ ঘোষ কেমব্রিজ এবং লণ্ডনে 'লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার' নামে একটি গুপ্তসমিতি গড়ে তোলেন। ১৮৯৬ সাল নাগাদ আইরিশ বিপ্লবী এবং বৃটিশ শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন চারুচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। এর অনেক পরে আইরিশ বিপ্লবী ডি ভ্যালেরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে

সুভাষচন্দ্রের। দাদাভাই নৌরজি এর আগেই বৃটেনে গিয়ে পৌঁছোন। ১৯০৪ সালে আমস্টারডামে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সম্মেলনে তাঁকেও দিতে দেখা যায়। গিরিশ মাথুর জানাচ্ছেন, ১৯০৫ সালে গঙ্গাধর তিলক বোম্বাইয়ের তদানীন্তন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষার জন্য রাশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। ওই বছরেই শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা বৃটেনে প্রতিষ্ঠা করেন ইণ্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়া হাউস। প্রকাশ করলেন দ্য ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকা। ১৯০৭ সাল নাগাদ কৃষ্ণবর্মা চলে যান প্যারীতে এবং যোগ দেন সর্দার সিং রাওজী রাণা এবং শ্রীমতী ভিকাজী রোস্তম কামার সঙ্গে। দেশের স্বাধীনতার জন্য এঁরা যৌথ উদ্যোগে একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, ১৯১২ সালের ২০ অক্টোবর কৃষ্ণবর্মাকে একটি চিঠি লেখেন ম্যাক্সিম গোর্কি। সেই চিঠিতে রিভিউ পত্রিকার জন্য কৃষ্ণবর্মার কাছে একটি প্রবন্ধ চান গোর্কি যার বিষয় হবে ভারতীয় মুক্তি আন্দোলন। গোর্কি লেখেন : আমরা পেতে চাই ঐতিহাসিক চরিত্রের এক প্রবন্ধ যাতে থাকবে মুক্তির সন্ধানে ভারতীয়রা যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন তার সম্পর্কে সমুজ্জ্বল সব তথ্য। গোর্কি আরও বলেন ; এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির পরিচয় আমাদের ঘটাতেই হবে...আপনি বুঝবেন সমকালীন ভারতবর্ষের জীবনের কোন্ খবর রুশ জাতিকে জানতেই হবে।[২২] এই প্রসঙ্গে আরও তথ্য পাওয়া যায় যে কৃষ্ণবর্মা প্রবন্ধ লিখতে না পারলেও তাঁর পত্রিকা গোর্কিকে পাঠিয়েছিলেন এবং গোর্কি সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেন্ট্ পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত সোভ্রেমেন্নিক পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ওপরে। ওই প্রবন্ধে বিপ্লবী সাভারকরের কথা উল্লেখ করেন গোর্কি। এই ভাবেই বিপ্লব-প্রয়াসী রুশদের সঙ্গে এক গভীর বন্ধন গড়ে ওঠে বিপ্লবী ভারতীয়দের।

লণ্ডনে এবং প্যারীতে বিপ্লবী সমিতি গড়ে তোলার মতো প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল বার্লিনে, স্টকহোমে, পেত্রোগ্রাদে এবং মস্কোয়। ১৯১৪ সালে বার্লিনে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি গঠন, বিভিন্ন দেশে সেখান থেকে মিশন পাঠানো, ১৯১৫ সালে কাবুলে অস্থায়ী এক স্বাধীন ভারত সরকার গঠন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী গদর পার্টি গঠন—এসবই ঘটে যাচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুত, এক

প্রবল রাজনৈতিক স্রোতের টানে। এবং এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে, এঁদের মধ্যে অনেকেই বলশেভিক মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালে। এসময়ে ঘটে দুটি ঘটনা। এক, ১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণে লর্ড কার্জন সমগ্র এশিয়াবাসীকে মিথ্যাবাদী, অসাধু ও কপটতাপ্রিয় বলে আখ্যা দেন। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা বাংলাদেশ। দুই, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব, যার বিরুদ্ধে সারা দেশে বয়ে যায় প্রবল প্রতিবাদের বন্যা। কার্যত এখান থেকেই শুরু হয় স্বদেশী যুগ, দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রত্যক্ষ আন্দোলন, এবং এরই একটি অংশ ঝুঁকে পড়ে বিপ্লবচেতনায় যাকে তদানীন্তন সরকারী ভাষ্য চিহ্নিত করে সন্ত্রাসবাদী বলে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টই বলেছেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকেই বাংলার বিপ্লববাদের উৎপত্তি।[২৩] এই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল চেহারাটা হয়ে দাঁড়ায় এইরকম: বিদেশী শাসনকে অস্বীকার করো, বিদেশী জিনিসকে বর্জন করো, সশস্ত্র পদ্ধতিতে বিদেশী শাসনকে উৎখাত করো। এর পাশাপাশি 'ইংরেজদের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে অসহযোগিতা করো'—এই স্লোগানের ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন একটু একটু করে গড়ে উঠতে থাকলেও, সশস্ত্র পদ্ধতিতে বিদেশী শাসনকে উৎখাত করার আহ্বান অনেক বেশি জোরালো হয়ে দেখা দেয়। বাংলা সহ বিভিন্ন রাজ্যে এই আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠতে থাকে অসংখ্য বিপ্লবী দল। এদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নেয় যুগান্তর এবং অনুশীলন। বেশ কিছু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এইসব বিপ্লবী দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্তও হয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে অনেকেরই আবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, কেউ কেউ সম্পাদনাও করতেন। স্বাভাবিকভাবেই ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত সময়কালে সংবাদপত্রের যে ভূমিকা ছিল শুধুমাত্রই প্রতিবাদী, এই সময়ের পর থেকে তা হয়ে উঠতে শুরু করে অনেকবেশি বিপ্লবী-ভাবনা চিহ্নিত। আমরা আগেই দেখেছি, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কথাবার্তা আলোচনা এবং ইচ্ছা এতদিন পর্যন্ত ধরা পড়ছিল হাল্কা হাওয়ার মতো। এবার তা চেহারা নিল মেঘের গভীর থেকে উঠে আসা কাল-বৈশাখীর। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হলো ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকা। ব্রহ্মবান্ধব সম্পাদকীয়তে লিখলেন: আমাদিগকে সর্বতোভাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। আমরা স্বরাজগড় প্রতিষ্ঠা করিব।

সেখানে ফিরিঙ্গীর কোনো নামগন্ধ থাকিবে না। জেমস ক্যাম্পবেল কার লিখছেন : The paper was extremely seditious and fanatical, and in August 1907 proceedings were taken against it, the manager Saroda Charan Sen was arrested on the 29th, and the editor Brahmo Bandhab Upadhyaya and the printer and the publisher Haricharan Das on September 3rd. While the case was still pending the editor died……[২৪] য হৃগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখছেন : টিনওলা, ছুতোর মিস্ত্রী, কামার-কুমোর, ছোট দোকানদার কে না কিনতো এ কাগজ ? একটি কাগজের চারপাশে অসাধারণ ভিড় নিয়মিত-ভাবে দেশের খবর শুনতো……সাহেবরা এর ওপর ভারী চটা ছিল কেননা সন্ধ্যা তাদের ফিরিঙ্গী ছাড়া অন্য আখ্যায় বর্ণনা করত না। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে একাগজের প্রতিষ্ঠাতা খুব সাফল্যলাভ করেছিলেন। সাধারণের ভিতর নতুন দেশপ্রেম ঢোকাতে ও ছড়াতে এ কাগজ ছিল অদ্বিতীয়।[২৫] ব্রহ্মবান্ধব সন্ধ্যা-য় লিখেছেন : পত্তীভ্রষ্ট হইও না। নিজেদের সর্বস্বের প্রতি মমতাযুক্ত হও। যে শক্তি আজ সুষুপ্ত, তাহাই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত উদ্ভাসিত হইয়া সর্ব দুর্গতি মোচন করিবে। কিন্তু পরমুখী হইলেই সর্বনাশ। লক্ষ্যণীয়, ব্রহ্মবান্ধব সন্ধ্যা-য় প্রকাশিত নানা লেখা ও রচনায় বারবার ইংরেজ বিতাড়নের কথা বলেছেন এবং সেটা সশস্ত্র পদ্ধতিতে, কিন্তু নিজস্ব শক্তিতে। ব্রহ্মবান্ধব 'স্বরাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক এবং 'করালী' নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এইসব পত্র পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যায়। মামলা চলার সময়ে আদালতে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেন : I accept the entire responsibility of the publication management and conduct of the newspaper 'Sandhaya' and I say, I am writer of the article 'Ekhan Theke Gechi Premer Dai' which appeared on Aug 13,1907 being one of the articles forming the subject matter of this prosecution. But I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God appointed misson of swaraj, I am in any way acconntable to the alien Govt. who happen to rule over us and whose

interest is and must necessarily be in the way of our true national development.[২৬]

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : লর্ড কর্জন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়-সঙ্কল্প হলেন। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মরলি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠলো তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা।

এর পরেই ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় যুগান্তর। জেমস ক্যাম্পবেল কার লিখেছেন : The first and most pernicious of the revolutionary papers of Calcutta was the Yugantar (New Era) started in 1906 by Barindra Kumar Ghose and Abinash Chandra Bhattacharji, members of the Manicktolla Conspiracy and Bhupendra Nath Dutta, the brother of Swami Vivekananda, founder of the Ramkrishna Mission. The paper was seditious from the very start, but before being prosecuted it received on June 7th, a warning from the Government of Bengal in respect of an article which appeared in the issue of 2nd of June The warning had no effect, and the issue of June 16th contained two articles entitled 'Away with fear' and 'The Medicine of the Big Stick' for which Bhupendra Nath Dutta, as editor was prosecuted. He admitted full responsibility for the articles and was convicted by Mr. Kingsford on 24th July 1907, and sentenced to one year's rigorous imprisonment ; the press was ordered to be confiscated as an instruement used in the Commission of the offence. On appeal the conviction and sentence were upheld, but the order of confiscation was set aside by the High Court on the ground that the press could

not be so regarded. The paper re-appeared at once and the tone was worse than before. A prosecution was therefore instituted againts. Abinash Chandra Bhattacharji as manager of the paper, and Basant Kumar Bhattacharji as printer and publisher, in respect of articles in the issues dated 30th July and 5th and 12th August 1907.[২১]

আসলে 'সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের মুক্তি'—এই ছিল যুগান্তরের চিহ্নিত পথ। যুগান্তর সম্পর্কে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি এই পত্রিকা পরিচালনা করতেন এবং পরবর্তীকালে কমিনটার্নের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন) লিখেছেন : যুগান্তর পত্রিকার মূল নীতিই ছিল, হায় হায় রব তুলিয়া বুক চাপড়াইয়া স্বদেশপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিব না। বরং কনস্ট্রাকটিভ প্রোগ্রাম দিয়া দেশকে কি করিয়া স্বাধীন করিতে হয় তাহার পথ প্রদর্শন করিব। প্রথম হইতেই যুগান্তর পত্রিকার টোন বা সুর অতি গুরুগম্ভীর ছিল। ইহার সুর সন্ধ্যা পত্রিকা অপেক্ষাও চড়া ছিল। সন্ধ্যার সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া যুগান্তর পত্রিকাকে প্রথম হইতেই আরও বেশী চড়া সুরে কথা কহিতে হইল। যুগান্তরের সুর এত চড়া ছিল যে তৎকালের অন্য কোন পত্রিকাই ইহাকে হারাইতে পারে নাই।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যুগান্তর সম্পর্কে লিখেছেন : ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে অর্থাৎ বঙ্গচ্ছেদ হইবার পাঁচ মাস পরে যুগান্তর নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা যুবকদিগকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রয় করিতে দেখা গেল। যাহারা পড়িল তাহারা চমকিয়া উঠিল—ইহার ভাব ও ভাষা হিতবাদী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি সাপ্তাহিক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শারীরিক শক্তির দ্বারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসিতে হইবে, হত্যা পাপ নহে—গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হত্যায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন ; আত্মা অমর—এই শিক্ষা দিয়া যুগান্তর যুবকগণকে মৃত্যুভয়হীন করিয়া তুলিবার প্রয়াসী।

যুগান্তর পত্রিকার ওপর কম করেও বার আটেক পুলিসের আক্রমণ চলেছে। বার বার গ্রেপ্তার হয়েছেন যুগান্তরের পরিচালকরা। যুগান্তর ছাপাখানার বেশ কিছু জিনিস এবং কাগজপত্রও আটক করা হয়েছে বারবার। ইংরেজ সরকার যে যুগান্তর নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইংলিশম্যান পত্রিকায়। বার বার আঘাত সম্পর্কেও যুগান্তর যে প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল ইংলিশম্যানের

কথায়। যুগান্তর ইংরেজ সরকারের কাছে এতই ভয়াবহ ওঠে যে ১৯০৮ সালের ৮ জুন সরকার নিউজ পেপারস (ইনসাইটমেন্ট টু অফেনসেস) অ্যাক্ট জারি করতে বাধ্য হয়। এর কিছু দিন পরেই পুলিস হামলা চালিয়ে যুগান্তর পত্রিকার নিজস্ব ছাপাখানাকে ধ্বংস করে। ১৯০৮ সালের ৬ জুলাই যুগান্তরের সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সময়ে এই পত্রিকার প্রচার ছিল ২০ হাজার। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়াও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিপ্লববাদে বিশ্বাসী অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ।

যুগান্তর সম্পর্কে এক আশ্চর্য নথি পাওয়া যায়।[২৮] এই পত্রিকার ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। এসম্পর্কে ইংরেজ সরকারের একটি নোটে বলা হয় :

YUGANTAR
REDIVIVUS

An English Edition
More diabolical than before.

If there is anything in a small printed broadside we have received this morning, the Yugantar has clothed itself with a new avatar more outrageously and diabolically violent than before. The sheet in question is a demiquarto consisting of two columns printed in English on one side and at the top.

YUGANTAR

Vol. III Calcutta Yugantar June 18, 1908, No. 7

The contents of the broadside are two : Notice, An appeal.

The Notice begins as follows :

The Yugantar is not a paper but a revolutionary idea which however persecuted and prosecuted can never be suppressed.

Then follows half a column of the wildest incitement to wholesale murder and assasination. Naturally we omit

this. The appeal opens with another quarter of a column of the same kind of staff and then follows the really horrible part of the broadside for the whole of its remaining column and quarter is taken up with minute directions how to make picric acid, fulminate of mercury and cast iron shells.

There is no imprint of course nor any other means of discenting whence this devilish production emanates. It bears the Simla postmark however and on the back of it is written in an educated hand the following :

See how hundreds of thousands are distributed in Calcutta. There is not an important family left which has not been supplied with a copy. How futile your attempt to suppress the Press.

On the other hand our translator is of opinion that the above production has no connection with the Yugantar. His principal reason is that it is printed in English whereas the promoters of Yugantar have undertaken to deliver the sheet to the Zenanas. That being the case he thinks it improbable that they should have decided to produce it in English as 9/10th of the inhabitants of Zenanas are ignorant of English.

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন শুরুর কিছু পরেই ১৯০৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। এই অধিবেশনেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয় স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা। লক্ষ্য এক হলেও মতান্তর থেকে যায় পদ্ধতি নিয়ে। আগেই বলেছি, বিপ্লববাদী আন্দোলনের দিকে ইতিমধ্যেই ঝুঁকে পড়েছিল একটা বড়ো অংশ, সরকারি পরিভাষায় যারা সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত। এদেরই মুখপত্র হয়ে ওঠে কিছু পত্রপত্রিকা, সন্ধ্যায় যার সূচনা, যুগান্তরে বিস্তার। পাশাপাশি নিরস্ত্র এবং অহিংস আন্দোলনের কথাও কেউ কেউ বলেন এবং তাঁদেরও কয়েকটি মুখপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। তবে লক্ষ্যণীয়, ১৯০০ সালে যে-সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁর বেঙ্গলী পত্রিকায় ডন পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনা প্রকাশ করেন 'ইংলণ্ডের মহত্ত্ব ও ভারতের লাভ' এই

শিরোনামে, এবং যে-সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১৯০২ সালে আহ্‌মেদাবাদ কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন যে 'ভারতের স্থায়ী বৃটিশ শাসনের পক্ষে আমরা অভিমত জানাচ্ছি', সেই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীরাই ১৯০৬ সালে পূর্ণ স্বরাজের কথা ঘোষণা করেন। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এই পরিবর্তন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবং এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ ছিল ব্যাপক মানুষের মনে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী চিন্তার বিকাশ, বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠা এবং সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে জাতীয় রাজনীতির ওপর প্রভাব সৃষ্টি। ভ্যালেন্টাইন চিরল তাঁর ইণ্ডিয়া আনরেস্ট বইতে এই সময়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে-কটি চরমপন্থী বা বিপ্লববাদী সংবাদপত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো: হিন্দু স্বরাজ্য, যুগান্তর, গুজরাত, শক্তি, কাল, ধর্ম, হিতৈষী, খুলনাবাসী, কল্যাণী, প্রেম, বার্তাবহ, আকাশ, কেশরী, কর্ণাটক বৈভব, রাষ্ট্রমত, বিশ্ববৃত্ত, নিউ ইণ্ডিয়া, বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা, বেঙ্গলী, হিতবাদী, ঢাকা গেজেট, জর্ণশিয়াল, নবশক্তি এবং স্বারিক।

'১৯০৫ থেকে ১৯০৭-এর মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সম্মেলন স্বদেশী আন্দোলনে এবং স্বদেশী আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের চেহারা নেয়। এই পরিবর্তন বৃটিশ রাজনীতিবিদদের মনে বিশেষ দাগ কাটে। ফলে ১৯০৭-এ বড়লাট মিণ্টো এবং ভারতসচিব মর্লি উভয়ে শাসন সম্পর্কে কতকগুলি পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। ১৯১০-এর মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি একই সঙ্গে অন্তরীণ নেতারা মুক্তি পান এবং ছাপাখানা আইন প্রবর্তিত হয়। ছাপাখানা আইনে বলা হয়, মুদ্রাকরকে সরকারের কাছে নগদ টাকা জমা রাখতে হবে—জামিন বা জামানত হিসাবে, সংবাদপত্রে আপত্তিকর কিছু ছাপলে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে, তারপরেও কোনো অপরাধ করলে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হবে। ১৯১০ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে এই আইনের বলে ৩৫০টি মুদ্রাযন্ত্র, ৩০০ খানা সংবাদপত্র ও ৫০০ বই বাজেয়াপ্ত হয়।'[২৯]

তবুও এরই মধ্যে বিদ্যুৎ কণার মতো বেরিয়ে আসে ১৯০৬ সালে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সম্পাদনায় নবশক্তি, ১৯০৮ সালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৈনিক নায়ক এবং ১৯১৪ সালে হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত দৈনিক বসুমতী। এছাড়া ছিল ইংরেজি দৈনিক বন্দেমাতরম। যদিও পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে বন্দেমাতরম ছিল নিরস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের

সমর্থক। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হয় বিপিনচন্দ্র পালের। যদিও ১৯০১ সালেই প্রথমে মডারেট এবং পরে চরমপন্থায় বিশ্বাসী বিপিনচন্দ্র নিউ ইণ্ডিয়া নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। বন্দেমাতরম পরিচালনা করতেন অরবিন্দ ঘোষ।

এই সময়ের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এদেশীয়দের উদ্যোগে বাংলা বা অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও ইংরেজিতে একাধিক সংবাদপত্র বেরনো। শুধু শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রচারিত হওয়াই নয়, বিপ্লবী ভাবনাকে সর্বভারতীয় স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন উদ্যোগও এর পেছনে ছিল। তাছাড়া একই সঙ্গে পাঞ্জাবে, গুজরাতে, উত্তরপ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে বিপ্লববাদের যে-আগুন জ্বলে উঠেছিল তাকে ঐক্যবদ্ধ করার একটা প্রয়াসও ছিল এইসব ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের পেছনে। পাশাপাশি এই সময়েই ইংরেজরা সরাসরি অথবা বৃটিশ অনুরাগীদের মাধ্যমে কিছু ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে (স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, এশিয়ান, পাইওনিয়ার, টাইমস অব ইণ্ডিয়া)। উদ্দেশ্য ছিল ওই সব স্বদেশী ইংরেজি পত্রিকার বিরোধিতা করা এবং ওই সব পত্রিকার পাঠকগোষ্ঠীকে বিপ্লবী স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে মোহমুক্ত করা। এদেশীয় সংবাদপত্রের জগতে এই দ্বন্দ্ব বৃটিশেরই সৃষ্টি, যদিও তার উদ্দেশ্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। কার্যত এই ব্যর্থতার জন্যই ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তা অত্যাচারের চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে পৌঁছোয়। ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত, পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া, সম্পাদক প্রকাশক ও অন্যান্যদের জেলখানায় পাঠানো ইত্যাদি দমনপীড়ণ এই সময়ে এতই বেড়ে যায় যে ইংরেজ কর্তাব্যক্তিরাও এতে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে মিন্টোকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে মর্লি লেখেন ঃ সকল ক্ষেত্রে এইভাবে দণ্ড-বিধান করাকে মেনে নেওয়া যায় না। শৃঙ্খলা রক্ষা আমাদের করতেই হবে, কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষার পথ মাত্রাতিরিক্ত শাস্তিদান নয়। এই ব্যবস্থা বোমার পথকেই প্রশস্ত করবে।

সন্দেহ নেই, মর্লির এই আশঙ্কা এবং তার বাস্তব পরিণতি ভারতের বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন এবং সংবাদপত্রের ভূমিকাকে এক আশ্চর্য ঋজুতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ওদিকে ১৯০৩ সালে লেনিন প্রকাশ করেন ইসক্রা পত্রিকা, লেনিনের লেখার গ্রুপের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। ইসক্রা হয়ে ওঠে তদানীন্তন রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির মুখপত্র। ১৯০৩ সালেই এই দলের দ্বিতীয় কংগ্রেসে আন্দোলনের পদ্ধতিতে লেনিনের সঙ্গে বিরোধ বাধে মারতভ, ট্রটস্কি, আক্সেলরদ প্রমুখ নেতাদের। কার্যত এখান থেকেই রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টিতে ভাঙনের চিহ্ন দেখা দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠরা যান লেনিনের পক্ষে এবং চিহ্নিত হন বলশেভিক হিসাবে। এবং সংখ্যালঘুরা মেনশেভিক নামে পরিচিত হন। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত লেনিনের 'এক পা আগে দু'পা পিছে' বইটি আসলে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের তাত্ত্বিক যুদ্ধ অভিযানেরই একটি ফসল। লেনিনবাদ কথাটি তখনও প্রচলিত হয়নি, পরিবর্তে তা শিকড় ছড়াতে শুরু করেছে বলশেভিকবাদ নামে, অন্তত এদেশে, ভারতবর্ষে। ১৯০৪ সালেই জাপানের সঙ্গে শুরু হয় রাশিয়ার যুদ্ধ। ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও আন্দোলনে বিপর্যস্ত রাশিয়াকে এই যুদ্ধের মারফৎ কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে, এটাই ছিল রুশ শাসকদের ধারণা। কিন্তু যুদ্ধে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট জাপানের কাছে কোনঠাসা হলো রাশিয়া। লেনিন লিখলেন: It is the autocratic regime and not the Russian people that has suffered ignoble defeat, the Russian people has gained from the defeat of the autocracy. The capitulation of Port Arthur is the prologue to the capitulation of tsarism. এই জনবিরোধী যুদ্ধ তীব্রতা সৃষ্টি করল গণবিদ্রোহের। ১৯০৫ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গের পুতিলভ কারখানায় ধর্মঘট সংগঠিত হয়। শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নেয় ৯ জানুয়ারি তারিখে তারা বিশাল মিছিল নিয়ে জার-এর উইন্টার প্যালেসে যাবেন এবং দাবিপত্র পেশ করবেন। প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক সেদিন জড়ো হয়েছিলেন মিছিলে স্ত্রী ও শিশুসহ। মিছিলের ওপর সেনাবাহিনী গুলি চালায়। কয়েক হাজার মানুষ নিহত হন। জারের কাছে দাবিপত্র পেশ করার নম্র মানসিকতা পরিণত হয় তীব্র ঘৃণায় এবং প্রশ্ন ওঠে অস্ত্র গ্রহণের। সারা দেশে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন। ওয়েলস, ভোরোনেস এবং কুরস্কে দেখা দেয় কৃষক বিদ্রোহ। ১৯০৫-এর ৯ জানুয়ারি সূত্রপাত ঘটে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের, প্রকৃত অর্থেই যা বিপ্লব! ১৯০৫-এর এই ঘটনাকে লেনিন চিহ্নিত করেছেন মহাবিপ্লবের ড্রেস রিহার্সাল হিসেবে।[৩০]

এদেশের মানুষ এবং এদেশের সংবাদপত্রের ওপর ১৯০৫-এর এই রুশ বিপ্লব প্রয়াসের প্রতিক্রিয়াও যথেষ্ট গভীর। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবাসী পত্রিকায় এর ওপর একাধিক রচনা লেখেন এবং এই বিপ্লব-প্রয়াসকে তিনি স্বাগত জানান 'স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রপীড়িত রুশ জনসাধারণের ন্যায্য অভ্যুত্থান' বলে। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকায় গান্ধীজী তখনই দাবি জানান ঐ বিপ্লব-প্রয়াসে যোগদানের অপরাধে সেন্ট পিটার্সবুর্গের পিটার ও পল দুর্গে আটক ম্যাক্সিম গোর্কির মুক্তির জন্য। সেই আন্দোলনের কিছু কাগজপত্র হয়তো পৌঁছেছিল ঐ দুই সম্পাদকের দপ্তরে। গান্ধীজী গোর্কির একটি ছোট জীবনীও প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পত্রিকায় এবং তাতে তাঁরই কবিতার নামে গোর্কির নামকরণ করা হয়েছিল বিপ্লবের ঝোড়ো পাখী বা স্টরমি পেট্রেল। ৩১

এবং উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ শৈলেশনাথ বিশী 'বোলশেভিকবাদ' নামে একটি বই লেখেন। যার ভূমিকা লিখেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। বিজলী পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ৪১ সংখ্যায় (১৩ ভাদ্র, ১৩৩১) এই বইটির একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এ থেকেই বোঝা যায় রুশ বিপ্লব প্রয়াস এদেশের মানুষ এবং সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করতে থাকে ১৯০৫-০৬ সাল থেকেই। ১৯১১ সালে পরবর্তীকালের খিলাফৎ আন্দোলনের অন্যতম নেতা মহম্মদ আলি কলকাতা থেকে কমরেড নামে একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার সূচনা করেন। সংবাদপত্রের নাম 'কমরেড' হওয়াও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

সন্ধ্যা এবং যুগান্তরের পর যে বাংলা পত্রিকাটি বিপ্লববাদী ভাবধারার ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তা হলো ১৯১১ সালে প্রকাশিত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বিজলী। পরে কিছুদিনের জন্য এর দায়িত্ব নেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং তারও পরে নলিনীকান্ত সরকার। কিন্তু বিজলী পত্রিকার তাৎপর্য অন্য জায়গায়।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল তার ভিত্তি ছিল অনেকটাই আবেগ। বিপ্লবী তত্ত্বের কোনো স্থান সেখানে ছিল না। অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলন এবং শ্রমিক ও কৃষক অসন্তোষের যেসব ঘটনা এদেশে এসে পৌঁছতো তাকে

নতুনতর উদ্দীপনার সৃষ্টি হতো বটে, কিন্তু এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক কর্মসূচীর কোনো ছক তৈরিতে তা সাহায্য করতে পারেনি। যার ফলে বেশ কিছু গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা সত্ত্বেও সেই সময়ের বিপ্লববাদীরা শুধুমাত্রই অস্ত্র নির্ভর হয়ে পড়া এবং কিছু বিশিষ্ট ইংরেজ কর্তাব্যক্তিকে নিহত করা ছাড়া বড় রকমের কোনো ভাবনায় পৌঁছোতে পারেননি। স্বদেশপ্রেমের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবেই এরা আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা দাবি করলেও, মানতেই হবে, এর পেছনে সুষ্ঠু রাজনৈতিক বিশ্লেষণ খুব একটা কাজ করেনি। আর কাজ করেনি বলেই ১৯১৫-১৬ সাল নাগাদ এই ধরণের প্রয়াস কিছুটা কমে আসে। আবেগ-নির্ভরতা সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে ক্রমশঃ প্রাধান্য পায় যুক্তি, এবং এই দৃশ্যান্তর ঠিক কীভাবে ঘটেছিল তার সাক্ষী বিজলী পত্রিকা।

কেন এই পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছিল সে-সম্পর্কে সম্পাদকের টেবিল থেকে বিজলী পত্রিকায় একটি নিবন্ধে বলা হয়েছিল : বিজলীর কর্মভার গ্রহণ করিবার আগে মনে পড়ে আজ ৪ বৎসর আগেকার কথা। দ্বীপান্তর প্রত্যাগত বারীন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে কোনও এক মহানুযোগে আমার পরিচয় হয়। দেশের সত্যকার অবস্থা, সমাজের দুর্দশা, শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের অত্যাচার, বাঙালী জীবনের দুর্নীতি ও কলঙ্ক, জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা, এক কথায় জাতীয় জীবনের মধ্যে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির সমস্যাগুলি কি প্রকারে দেশের সর্বসাধারণকে বুঝান যায়, এই লইয়া তখন ইঁহাদের মধ্যে খুব জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এই সমস্ত চিন্তার মধ্যে বারীন্দ্রকুমার তাহার স্বভাবসিদ্ধ তেজের সহিত বলিলেন—'এই পচা গলা সমাজটার গতিবিধি না করিতে পারিলে দেশ দেশ বলে চীৎকার করিলে কিছুই হবে না।' তদানীন্তন সাময়িকপত্রের ভাষা অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত বা যৎসামান্য লেখাপড়া জানা লোকের পক্ষে বিশেষ বোধগম্য নয়, এই বিবেচনায় বারীন্দ্রকুমার স্থির করিলেন যে অতি সহজ ও সরল ভাষায় বাঙালীর জাতীয় সমস্যাগুলি একে একে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে এবং শুধু বক্তৃতায় নয়, কাজে এই সব সমস্যার নিরসন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিজলীর সৃষ্টি হইয়াছিল।[৩২]

এই বিজলী পত্রিকায় লেখা হয় : ভারতবর্ষের যা দাবী, তা সহযোগী, অসহযোগী এবং স্বরাজী সকলেই ত একবাক্যে প্রচার করছেন। দলের বিভিন্ন মত ও কর্মপদ্ধতিকে ছাড়িয়া সমগ্র দেশের অন্তর থেকে আজ স্বাধীনতার

দাবী অকুতোভয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিত্য নতুন আইনের নাগপাশে আজ অদম্য ইচ্ছাকে বেঁধে রাখা চলবে না।"[৩৩]

অতঃপর আর একটি সংখ্যায় : দেশে বোমা কেন এসেছিল আর কেনই বা চলে গেল সেই পুরানো কথা নিয়ে এতদিন পরে আবার সরগরম হতে আরম্ভ হয়েছে। বোমা এনেছিল বিপ্লবীরা একথা সবাই জানেন। কিন্তু কেন? বোমা মেরে জনকয়েক রাজকর্মচারীর মাথা উড়িয়ে দিলেই কি দেশ স্বাধীন হবে? না, এই ভুল ধারণা বিপ্লবীদের কস্মিনকালেও ছিল না। যুগান্তর সঙ্ঘের নেতা বারীন্দ্রকুমার ১৯০৮ সালে আদালতে একথা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন : বোমা মেরেই যে দেশ উদ্ধার হবে এ দুরাশা আমরা করিনি। তবে দেশের লোকে এক তরফা মার খেয়ে খেয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল বলেই তাদের মনটা চাঙ্গা করবার জন্যে বোমার আবিষ্কার। দেশব্যাপী বিপ্লবের যে আয়োজন চলছিল, বোমাটা তারি অঙ্গমাত্র। বোমাই বিপ্লবের সর্বস্ব নয়। বিপ্লববাদ দেশে থাকলেই যে বোমার রূপ ধরে তা সব সময় আত্মপ্রকাশ করবে, এ কথার কোন মানে নেই। বোমার কতটুকু কাজ হতে পারে বা না পারে তা ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই কয় বছর ধ্বস্তাধ্বস্তির ফল হয়েছে এই যে এখন স্বাধীনতার কথা সকল লোকেরই মুখে। সকলেরই অন্তরিন্দ্রির ভয় ভেঙে গেছে। দেশব্যাপী অত্যাচার সত্বেও লোকের মন দমে যাচ্ছে না। আর ভবিষ্যতে দমবারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বোমা যে জন্য এসেছিল সে কাজ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বোমার তিরোভাব হয়েছে। দেশের যে কতখানি পরিবর্তন হয়েছে তা বোঝা যায়, যখন দেখি কুলি-মজুরেরা পর্যন্ত স্বরাজের আলোচনা করতে আরম্ভ করছে। এমন কি পুলিসের কর্মচারীরা পর্যন্ত পেন্সনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বাধীনতার বার্তা ঘোষণা করছেন।

কিন্তু বিপ্লববাদীরা কোথায় গেলেন? তাঁদের কোন সাড়াশব্দ নেই কেন? রিফর্ম বিলের শান্তিজল মাথায় পড়ায় তাঁরা শান্ত হয়ে গেছেন, এই অনুমান করে কেউ কেউ তাদের গায়ে খানিকটা বীররস উদ্গার করে দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে বিপ্লববাদীর সংখ্যা কত তা আমরা জানিনে। গত যুদ্ধের সময় প্রায় দেড় হাজার যুবককে বিপ্লববাদী বলে অন্তরীণে রাখা হয়েছিল। তাঁরা কি আশা করেন যে বিপ্লববাদীরা সবাই মিলে গোলদীঘির ধারে জমায়েত হয়ে বক্তৃতা দেবেন যে তাঁদের মত বদলায়নি, না খানকতক

তলোয়ার আর গোটাকতক বন্দুক নিয়ে তাঁরা পুলিশ সার্জেন্টদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেবেন? দেড় হাজার যুবক প্রাণ দিলেও যে দেশ স্বাধীন হয় না এ কথাটা তাঁরা বেশ ভালোই জানেন। দেশের অধিকাংশ লোক যতদিন না স্বাধীনতা লাভ করবার জন্যে মরতে প্রস্তুত হয় ততদিন স্বাধীনতা লাভ যে দুঃসাধ্য এ অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়েছে। স্বাধীনতার নাম শুনলে যখন দেশের লোক চমকে উঠতো তখন বিপ্লববাদীরা নির্ভীক চিত্তে স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন, দেশের লোক যখন অত্যাচারের ভয়ে স্বদেশী আন্দোলন ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন নিজেদের মাথা লুটিয়ে দিয়ে বিপ্লববাদীরা দেশের ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলেন। দেশের লোক আজ তাঁদের কার্য্যপ্রণালী মেনে না নিলেও তাদের আদর্শ মেনে নিয়েছে। নিতান্ত পচা মডারেট ছাড়া সকলেই দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা চান।

মতভেদ আছে উপায় নিয়ে। দেশের অধিকাংশ লোকেরই এমন মত যে মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে অসহযোগ নীতি অবলম্বন করলে স্বাধীনতা লাভ হতে পারে, অন্ততঃ হয় কি না হয় তা একবার দেখা উচিত। দেশের লোকের মতের, বিরুদ্ধাচরণ করে বিপ্লববাদীরা কৃতকার্য হতে পারে না। এ অবস্থায় বিপ্লববাদের কোন রকম বহিঃপ্রকাশ যদি দেখা না যায় তা থেকে কি একথা বলা চলে যে বিপ্লববাদীরা সুখের পরাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন! বোমা বিপ্লববাদের অস্ত্র মাত্র, বিপ্লব স্বাধীনতালাভের একটি উপায় মাত্র। এ কথাগুলি ভুলে যাঁরা যান, তাঁরাই তালে, ঘোলে, অম্বলে একাকার করে বসে থাকেন।[৩৪]

বিজলীর এই প্রতিবেদন থেকে কতগুলি জিনিস অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ১. ১৯০৫-০৭ সালের যে বিপ্লববাদী আন্দোলনের সূচনা তা পরবর্তীকালে কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। ২. স্তিমিত হলেও এই আন্দোলনের পরিস্থিতিগত যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিজলী তথা তদানীন্তন বিপ্লববাদীরা নিঃসন্দেহ। ৩. কিছুটা সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিলেও এটা যে বিপ্লবের পথ নয় সে সম্পর্কে কোনো দ্বিধা ছিল না। ৪. এই আন্দোলনের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া যে স্বাধীনতা সম্পর্কে গণ-চেতনার উন্মেষ তা অত্যন্ত পরিস্ফুট। ৫. সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে না মানলেও দেশের মানুষ যে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবে বিশ্বাসী, এ প্রশ্নও তর্কাতীত। ৬. কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব সেই সময়ে অনেকটাই প্রভাব

বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। ৭. বিপ্লববাদীরা এ সম্পর্কে জনগণের মোহমুক্তির জন্ত অপেক্ষামান। ৮. বিপ্লব কী এবং সেখানে অস্ত্রের ভূমিকা কতখানি তাও এই সময়ে বিপ্লববাদীদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার।

বিজলীর এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। অর্থাৎ তার সাত বছর আগেই ঘটে গেছে নভেম্বর মহাবিপ্লব। কমিউনিস্ট আদর্শ এবং ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছে এদেশে। বিক্ষিপ্ত বিপ্লববাদী আন্দোলনের পরিবর্তে সংগঠনগতভাবে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। বিজলীর মতো সংবাদপত্রে পড়েছে তারই ছায়া। বিজলী সেই পথেরই পথিক। ১৯১১ সালে বিজলীর জন্ম। ১৯২৫ পর্যন্ত তার পদচিহ্ন। ১৯১৭-র এক যুগসন্ধিকে বিজলী প্রত্যক্ষ করেছিল। ভারতের রাজনৈতিক ভাবনার ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে আছে বিজলীর মতো পত্রিকা।

যদিও একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিজলী প্রকাশের ঠিক এক বছর পরেই, ১৯১২ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় লালা হরদয়ালের লেখা : কার্ল মার্ক্স এ মডার্ন ঋষি। ভারতীয় কোনো পত্রিকায় এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত কোনো পত্রিকায় কার্ল মার্ক্স সম্পর্কে এটিই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা, যেখানে কার্ল মার্ক্সের শ্রেণী সংগ্রামের কথাও স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা হয়েছিল।

অর্থাৎ এই পর্যন্ত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা হলো এক প্রতিবাদী ভূমিকা থেকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লববাদের স্তরে বিকাশ। এবং অতঃপর তা স্থিত হয় এক নতুনতর উত্তরণে। সংবাদপত্রে জায়গা নেয় রাশিয়ার জনগণের সংগ্রামের কাহিনী, মার্ক্সের কথা, লেনিনের উচ্চারণ। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এই সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কিছুটা টালমাটাল করলেও ১৯১৭-র মহাবিপ্লবের সংবাদ জ্বেলে দেয় এক নতুন আলো। মহাবিপ্লবের ঢেউ প্লাবিত করে এদেশের বেশ কিছু সংবাদপত্রকে, যদিও সংবাদপত্রের ওপর নতুনতর রাজনৈতিক আক্রমণেরও সূচনা হয় এই কালেই। কিন্তু প্রকৃত অর্থেই বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তর ঘটে এই সময়েই।

৩.

মহাবিপ্লবের ঢেউ

১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর চিহ্নিত হলো নভেম্বর মহাবিপ্লবের বিজয় দিবস হিসেবে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের আপামর জনসাধারণ পুরণো সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করলো সমাজতন্ত্র, কার্ল মার্ক্সের দার্শনিক ভাবনার প্রথম সফল অভিব্যক্তি ঘটলো রাশিয়ায়। বাংলা সংবাদপত্রে এই ঐতিহাসিক ঘটনার তৎক্ষণাৎ কোনো প্রতিক্রিয়া অবশ্য দেখা যায়নি। ১৯১৮ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে কেশরী পত্রিকায় বাল গঙ্গাধর তিলক একটি প্রবন্ধ লিখলেন এই সোভিয়েত বিপ্লব সম্পর্কে এবং তাতে অভিনন্দন জানালেন লেনিনকে। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় Leninist Right of National Self Determination নামে একটি প্রবন্ধ। ১৯২০ সালের ২০ আগস্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় Mr. Lioyd Geoige and Soviet Government নামে একটি রচনা। ১৯২০ সালেরই ২১ আগস্ট তারিখে কেশরীতে আরেক প্রবন্ধ প্রকাশিত

হয় 'লেনিনের নৈতিক জয়' শিরোনামায়। ১৯২০ সালেই গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী সম্পাদিত হিন্দি মাসিক পত্রিকা প্রভা-র যে সংখ্যায় লেনিন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন রামাশঙ্কর অবস্থি এবং দৈনিক আজ পত্রিকার ৫ অক্টোবর সংখ্যায় 'লেনিনের স্থান' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। তবে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে At the crossroads প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : We have heard that Modern Russia is floundering in i's bottomless abyss of idealism because she has missed the sure foothold of the stern logic of Real Politik. We know very little of the history of the present revolution in Russia, and with the scanty materials in our hands we cannot be certain if she, in her tribulations is giving expression of man's indomitable soul against prosperity built upon moral nihilism. All that we can say is that the time to judge has not yet to come, especially as Real Politik is in such a sorry plight itself. No doubt if Modern Russia did try to adjust herself to the orthodox tradition of Nation-worship, she would be in a more comfortable situation today, but this tremendousness of her struggle and hopelessness of her tangles do not, in themselves, prove that she has gone astray. It is not unlikely that as a nation, she will fail, but if she fails with the flag of true ideals in her hands, then her failure will fade, like the morning star, only to usher in the sunrise of the New Age.[৩৫]

বাংলা পত্রপত্রিকায় রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া অসাধারণ। ডঃ মলয় বসু জানাচ্ছেন, ১৯১৭ সালেই মালঞ্চ পত্রিকায় একটি রচনায় এই বিপ্লব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় : সৈন্যদল পুষ্ট বিদ্রোহীরা জয়লাভ করিয়া সরকারী বড় বড় অফিস ও মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারীগণের আবাসভবন ঘেরাও করিয়া গোলাগুলিদ্বারা ধ্বংস করিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া সরকার পক্ষ পরাভব মানিতে বাধ্য হইলেন। একে একে উচ্চ রাজকর্মচারীগণ আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী হইলেন। বিদ্রোহের জয় হইল। মোহাম্মদী পত্রিকা লিখলো : এখন অচিরাৎ এদেশের জমিদারদের চালচলন বদলান আবশ্যক

হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা নিজেরা না বদলাইলেও কাল তাহাদিগকে আপনিই বদলাইয়া দিবে। যে কাল একদিকে সসাগরা পৃথিবীর শক্তি গর্ব্বিত সম্রাটকে প্রজাকুলের পাদমূলে নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার তুলনায় এই নগণ্য জমিদার তো কোন ছার। ১৯১৮ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন: বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম জাগ্রত হইয়া উঠিল, সেই ধর্ম্ম-বিরহিত র‍্যাসপুটিন নিহত হইলেন, রুশিয়ার সম্রাট পদত্যাগপূর্বক প্রজাগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং রুশিয়াতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল....আমাদের দেশে যদি নবযুগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ফলপ্রসূ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে যুগধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। ১৯১৮ সালেই ভারতী পত্রিকা লিখলো: ...রাশিয়ার বিপ্লব। সেখানকার বলশেভিক দল প্রজার বলকে সম্বল করিয়া জারের প্রভুতন্ত্র এবং ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া বসিল। ...প্রভুতন্ত্র ইউরোপ হইতে চিরবিদায় লইল। সর্ব্বত্র যথার্থ আত্ম-ক্রীড় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এইজন্যই বুঝি বিধাতা এতবড় একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া দিলেন। আমরাও ইতিহাস বিধাতার প্রলয় লীলার ভিতর দিয়া নতুন সৃষ্টির অপূর্ব্ব ছবি দেখিবার সুযোগ পাইলাম। এবং আরও উল্লেখ্য, ১৯১৭ সালেই প্রবাসী পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন: মানুষের নিজের দুর্দ্দশা দূর না হইলেও অপরের আনন্দ দেখিয়া সে যে সুখী হয়, ইহা মানব প্রকৃতির একটি মহৎ গুণ। ...এতবড় একটা পরিবর্ত্তন কখনও কোন দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অল্প রক্তপাতে সাধিত হয় নাই। ...এতগুলি জাতীয় লোকের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের প্রভাব জগতে নিশ্চয়ই অনুভূত হইবে। অন্য সব দেশের চিন্তাভার, আকাঙ্ক্ষা ও কৃতিত্বের উল্লাসের তরঙ্গ এখানেও আসিয়া পৌঁছে, আমাদের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া দরকার।[৩৬]

বাংলা পত্রপত্রিকায় রুশ মহাবিপ্লবের এই হলো প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। এবং অবশ্যই এদেশের বুদ্ধিজীবীদের। রবীন্দ্রনাথের লেখায় সংশয়ের কিছু ছাপ থাকলেও ইতিবাচক ইচ্ছার চিহ্নও পরিষ্কার। এই ধরণের সংশয়, অর্থাৎ বিপ্লবের ফসলকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে কি-না, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্তও ছিল। কিন্তু একথা মানতেই হবে, রুশ বিপ্লবকে এদেশের পত্রপত্রিকায় শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য এবং ঐতিহাসিক একটি ঘটনা বলেই তুলে ধরা হয়নি, রুশ বিপ্লব মানুষের স্বাধীনতা এবং মুক্তির যে পথ দেখিয়েছে তা-ও স্বীকার

করা হয়েছে। উপরন্তু এদেশে এক 'নবযুগকে সুপ্রতিষ্ঠিত' করার জন্য 'যুগধর্ম্মের অনুসরণ' করে চলার আহ্বানও জানানো হয়েছে। এই দেশ এবং এই দেশের সংবাদপত্রের ওপর রুশ বিপ্লবের প্রভাবের সূচনা এখানেই।

এর পরেই এলো প্রভাবের বিস্তার। রুশ বিপ্লব এবং লেনিন—এই বিষয়টি সুবিস্তৃতভাবে প্রথম প্রতিভাত হয় সংসঙ্গী নামে একটি পত্রিকায় ১৯২১ সালে। ওই পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখা হয়: সমগ্র রুশ রাজ্যে লেনিনের কি রকম দোর্দণ্ড প্রতাপ, জনসাধারণের চিত্তের ওপরে তাঁর নামের কি রকম যাদু শক্তি তা বর্তমান ভারত ও গান্ধী মহারাজের তুলনায় আমরা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। ...মোট কথা, লেনিনের তুল্য শক্তিশালী মানুষের সঙ্গে জগতের এই প্রথম পরিচয়। মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের এরকম সংযোগ পৃথিবীতে পূর্বে ঘটেনি, সাহিত্য সৃষ্টি আর সঙ্ঘসৃষ্টির (Organisation) এত বড়ো প্রতিভা একটা মানুষে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি, চরিত্রের ও মহাপ্রাণতার, প্রতিভার এবং কর্ম্ম সামর্থে এই অতিমানবের (Superman) যে বিরাট রূপ আমাদের চোখে ফুটে উঠেছে, তার পাশে অতীতের নেপোলিয়নরা ক্ষুদ্রকায় বামনের মত দেখায়...লেনিন বলতে এসেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার শেষ কথা, দেখাতে এসেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার (Culture) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (logical conclusion)।...গরীব প্রজাসাধারণের আজীবন বন্ধু যিনি, তিনি সাম্রাজ্য-লোভী দুরাকাঙ্ক্ষ জর্মন সম্রাটের গোয়েন্দা, একথা আমরা স্বীকার করতে পারলাম না, ইতিহাসও সেকথা কোন দিনই মেনে নেবে না।[৩৭]

১৯২১ সালেই ফণীভূষণ ঘোষ লেখেন লেনিনের একটি জীবনীগ্রন্থ। তাতে তিনি লেখেন: হিন্দুর নিকট গীতার যে রূপ, বোলশেভিকদের নিকট জার্মান দার্শনিক মার্ক্সের 'মূলধন' (Capital) নামক গ্রন্থ সেইরূপ। এক বছর পরে গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে 'আমাদের লক্ষ্য কি?' শিরোনামায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতের জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠিতে লেখেন: ভারতের কোটি কোটি লোকের কথা ভাবিয়া চলিতে হইবে। ...গণবৃন্দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিই আমাদের আদর্শ হইবে...তবেই তাহারা আমাদের সহায় সম্পদ হইবে। দেশের মুক্তিকামীদের .. এখন কার্ল মার্ক্স এবং মাস মুভমেন্টের চর্চা করিতে হইবে।[৩৮]

সংবাদপত্রের প্রসঙ্গে যাবার আগে মার্ক্স এবং লেনিন সম্পর্কে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যেসব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তুলে ধরা দরকার। চিন্মোহন সেহানবীশ এবং অবিনাশ দাশগুপ্ত এনিয়ে যথেষ্ঠ গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁরা জানান, ১৯২১ সালে শঙ্খ পত্রিকায় শচীন্দ্রনাথ সান্যালের 'লেনিন ও সমসাময়িক রুশিয়া' প্রকাশিত হবার পর ১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'লেনিনের ছাত্রজীবন' নামে একটি লেখা। ১৯২৩ সালের এপ্রিল-মে মাসে আত্মশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় অমূল্যচরণ অধিকারীর লেনিনের জীবনকথা এবং তার কিছু পরে, সংহতি কাগজে কেশবেশ্বর বসুর লেনিন। ১৯২৬ সালে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর বই লেনিন ও সোভিয়েট প্রকাশিত হয়, ১৯৩২ সালে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা লেনিন। ওই বছরেই বেরোয় সৌমেন্দ্রনাথের আরেকটি বই লেনিন ও রোজা লুকসেমবার্গ। ১৯৩২ সালেই সোমনাথ লাহিড়ী অনুবাদ করেন লেনিনের স্টেট অ্যাণ্ড রেভলিউশন বইটি রাষ্ট্র ও আবর্তন নামে। ১৯৩৫ সালে ম্যাক্সিম গোর্কির 'লেনিনের সহিত' বইটি অনুবাদ করেন মণিলাল শ্রীমানী। ১৯৩৯ সালে রেবতীমোহন বর্মণ লেখেন লেনিন ও বলশেভিক পার্টি। ১৯৪১-এ বেরোয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের রুশজাতির কর্মবীর। ১৯৪৩-এ নিরঞ্জন মজুমদারের বিজয়ী লেনিন। ১৯৪৪ সালে ধীরেন্দ্রলাল ধরের কমরেড লেনিন এবং ১৯৪৭ সালে সরোজ কুমার দত্ত অনূদিত নাদেঝদা ক্রুপস্কায়ার লেখা লেনিনের স্মৃতি। অন্যদিকে বিশ দশকের শেষে এবং ত্রিশের দশকে মার্ক্সের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রকাশিত হয়। লেখকদের মধ্যে ছিলেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, মণিময় প্রামাণিক, দেবজ্যোতি বর্মণ, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের অনুবাদ করেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবদুল হালিম, শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রজবিহারী বর্মণ ও সুশোভনচন্দ্র সরকার। এরপর প্রকাশিত হয় মার্ক্সের কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ, যার মধ্যে ছিল সোস্যালিজম ইউটোপিয়ান অ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক, অরিজিন অফ ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রোপার্টি অ্যাণ্ড দি স্টেট, ওয়েজ লেবার অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল, ওয়েজেস প্রাইস অ্যাণ্ড প্রফিট, কমিউনিজম ও বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া। অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন বিনয়কুমার সরকার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, আবদুল হালিম, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেবতী বর্মণ, শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী, মন্মথ সরকার, ফণী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশোভনচন্দ্র সরকার।[৩১]

নভেম্বর মহাবিপ্লবকে শুধু স্বাগত জানানো নয়, বাংলা সংবাদপত্রে বিপ্লবী অনুধ্যানের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল এর কিছুদিনের মধ্যেই। রুশ

'বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে যে-নজরুল ইসলাম ১৯১৯ সালে 'ব্যথার দান' উপন্যাসে নায়ককে বাধ্য করান লালফৌজে যোগ দিতে, সেই নজরুল ইসলামই ১৯১২ সালে ধূমকেতু নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে ঘোষণা করেন : সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকে। ভারতবর্ষের এক পরমানু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততাড়ী গুটিয়ে বোচকা পুটুলি বেঁধে সাগর পাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন বা নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনও। আমাদের এই প্রার্থনা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে।... আর বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে।'[৮০] নজরুল ইসলাম এর দু বছর আগে মুজফ্ফর আহমদের সহযোগিতায় সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ প্রকাশ করেছিলেন, যে-পত্রিকাটি দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রেখেছিল। মুজফ্ফর আহমদ স্বীকার করেছেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে, সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিলেন নজরুল। মুহাজিরদের ওপর একটি প্রবন্ধ লেখার অপরাধে ওই পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয় এবং নবযুগ বন্ধ হয়ে যায়। একদিক থেকে দেখতে গেলে ১৯১৭-উত্তরপর্বে নবযুগই প্রথম কাগজ যেখানে কিছুটা রুশ বিপ্লবের অগ্নিময় স্পর্শ ছিল। পরে এই তুলনায় ধূমকেতু হয়ে ওঠে ওঠে আরও কিছুটা দীপ্ত।

কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতিকেই এক অন্য অবস্থানে নিয়ে যায় আত্মশক্তি সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'আত্মশক্তি' পত্রিকাতে যেভাবে রুশ বিপ্লবের বন্দনা রচিত হয়েছে, যেভাবে এই বিপ্লবের সুফলকে ভারতবর্ষের মাটিতে রোপন করবার আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে রুশ বিপ্লবের সত্য ছবি ও প্রভাব বাঙালী চিত্তের উপর স্থায়ীভাবে পড়তে শুরু করেছিলো। শুধু সংবাদ পরিবেশনা নয়, এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য বিচিত্র রচনার মধ্যেও এই প্রভাবের

পরিচয় ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছিলো। ...আত্মশক্তি প্রকাশের প্রথম বছরেই 'ভিতরের ও বাহিরের বিপদ' নামে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। এই রচনাটিতে লেখা হয়...'রুশিয়ার অবস্থার সঙ্গে ভারতের অবস্থার অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া প্রথমেই বলসেভিজমের কথা মনে আসে। রুশিয়ার মত ভারত প্রকাণ্ড কৃষিপ্রধান দেশ। রুশিয়ার শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেমন ভারতবর্ষেও প্রায় তেমনি। উভয় দেশই ধর্মপ্রবণ, উভয় দেশেই জাতীয় আন্দোলন পর্যায়ক্রমে সমাজসেবা ও বিপ্লববাদরূপে দেখা দিয়াছে। রুশিয়ায় বিপ্লবের কাজ বাধা পাইলেই সমাজসেবার রূপ ধরিয়া শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে, আর পরিশেষে বলসেভিজমে আসিয়া পরিণত হইয়াছে। রুশিয়ার যে কারণে বলসেভিকবাদ প্রচার হইয়াছিল; ভারতবর্ষেও তার অনেকগুলি কারণ বর্তমান। যাহারা সমাজের ভিত্তির পাথরে চাপা পড়িয়া আছে আজ তাহারা সৌধবাসীর কাছে আপনার স্বত্ব স্বার্থ বুঝিয়া পাইতে চায়। তাহাদিগকে আর দাবাইয়া রাখা চলিবে না।'[৪১] (১২ এপ্রিল, ১৯২২)

অতঃপর ১২ জুলাই, ১৯২২-এ একটি প্রবন্ধে বলা হয়, 'আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় রুশিয়া তাহার স্বাধীনতার জন্য কী তীব্র সাধনা করিয়াছিল তাহা জানিয়া রাখা ভালো। নিরাশময় দুর্দ্দিনে তাহার জ্বলন্ত ত্যাগ ও আত্ম-বলিদানের ইতিহাস আমাদের হৃদয়ে নববলের সঞ্চার করিবে। ...নিহিলিস্টদের অধিকাংশই ছিল সমাজে উচ্চশ্রেণীর লোক। ইহারাই, সাধারণের মধ্যে কার্য করিবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিল। ...নিহিলিস্টদের মধ্যে ডাক্তার ছিল, প্রফেসর ছিল, ধাত্রী ছিল, ইহারা সকলে এক একটি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল। ...জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার অন্তরায়ও ছিল অনেক। ...হৈ চৈ করিবার তাহাদের কোন সুবিধা ছিল না। তাই তাহারা নীরবে কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং নীরবে কাজ করিতে হইয়াছিল বলিয়াই তাহারা যে কর্ম সমাধা করিয়াছিল তাহার ফল বহু বৎসরের অত্যাচারেও নষ্ট না হইয়া ১৯১৭ সালে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। ...আমাদের দেশেও...জেলে যাইবার জন্য যত লোক যেভাবে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার শতাংশের এক অংশও পাওয়া যায় না আজ গ্রামে কাজ করিবার জন্য। ...আমাদের দেশের এই অবস্থা দেখিয়া রুশিয়ার সেই মহান চিত্রপট চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে আর শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নত হইয়া আসে।'[৪২]

এইভাবেই সোভিয়েত মহাবিপ্লব ভারতের জনমানসে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিতে থাকে। আর এইভাবেই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে এদেশের, বিশেষত বাংলার সংবাদপত্রের চরিত্র ও কণ্ঠস্বর। কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগে দেশের এই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করাও বিশেষ জরুরি। কারণ বীজ নিহিত ছিল এখানেই।

১৯১৭ সালের নভেম্বরে রুশ বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় যখন ঘোষিত হলো তখন গান্ধীজী এদেশে সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছেন। ৮ নভেম্বর গান্ধীজী গেলেন চম্পারনে. ১০ নভেম্বর ভারতে এসে পৌঁছলেন মন্টেগু, বৃটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল নিয়ে। এদেশের স্বাধীনতা-পিয়াসী নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন, এক একজনকে এক একরকম সার্টিফিকেট দিলেন। এলাহাবাদের লীডার পত্রিকার সম্পাদক চিন্তামণি সম্পর্কে বললেন, সাংঘাতিক বুদ্ধিমান, সারা ভারতে এমন চালাক মানুষ তিনি আর দেখেননি। সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বললেন, সবই ভালো কিন্তু আপোষে আসতে চায় না। জিন্না সম্পর্কে মন্তব্য, প্রচণ্ড ভদ্র, দেখতে সুন্দর কথাবার্তা দারুণ। গান্ধীজীকে তাঁর মনে হলো সম্পূর্ণভাবে বাতাসের ওপর ভেসে বেড়ানো মানুষ, যিনি স্বপ্ন দেখতে ভীষণ ভালোবাসেন। অ্যানি বেসান্ত এবং তিলকও সার্টিফিকেট থেকে বাদ গেলেন না। কলকাতায় মন্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাত হয় অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, আশুতোষ মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে। ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা বলার পর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, স্বদেশী-বন্দীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় কবি পরিণত হয়েছে রাজনীতিকে। এর কিছুদিন পরেই ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন, সভানেত্রী অ্যানি বেসান্ত।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই, এই ডিসেম্বরেই ঘটলো মণিপুর বিদ্রোহ। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিদ্রোহ করলো কুকি এবং নাগারা। প্রায় গোটা বছর ধরেই খবর শোনা গেল, বিপ্লববাদীদের হাতে ইংরেজদের গোয়েন্দা বা অন্যান্যদের মৃত্যু, এবং বিপ্লবপন্থীদের গ্রেপ্তার, কারাবাস এবং মারা যাওয়ার নানা ঘটনা। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে ঘটলো তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১. বলশেভিক সরকারের কাছে ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে পেশ করা হলো একটি স্মারকলিপি। ২. দিল্লিতে কংগ্রেসের বৈঠক। ৩. সারা দেশ জুড়ে সর্বভারতীয় স্তরে শুরু হলো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন।

১৯১৯ সালের সূচনা গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ এবং রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিয়ে। গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত তখন কিন্তু দেশের মানুষ সহিংস প্রতিবাদে নেমে পড়েছে, প্রচণ্ড হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে আহমেদাবাদে। এপ্রিলের ১৬ তারিখে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত হলো রবীন্দ্রনাথের একটি খোলা চিঠি, গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কারই বললেন, গান্ধীজীর অহিংস-আন্দোলনের যথেষ্ট বিপদও আছে। চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১২ এপ্রিলে। আর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড হয় ঠিক তার পরের দিন, ১৩ এপ্রিল। রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড বর্জন করলেন ৩০ মে। কংগ্রেসের মডারেটরা অনুমোদিত মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বিলকে কার্যকর করার জন্য ইংরেজদের সাহায্য করতে কোমর বেঁধে নামলেন।

১৯২০ সালের ১০ মার্চ এবং ৮মে তারিখে গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের ওপর পরপর দুটি ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। ১ আগস্ট তারিখে ভাইসরয়কে গান্ধীজী জানালেন যে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে নামছেন। ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ কর্মসূচী গৃহীত হলো। ১৩ সেপ্টেম্বর গান্ধীজী শান্তি-নিকেতনে গেলেন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না। ১৬ অক্টোবর গান্ধীজী ঘোষণা করলেন: এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ। যদিও এই স্বরাজের অর্থ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস দলেরই কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কারণ ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আহমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে দেখা গেছে, স্বরাজকে স্বাধীনতা হিসাবে চিহ্নিত করার প্রস্তাব সেখানে নাকচ হয়ে যেতে। ১৯০৬ সালে যে-কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল, সেই কংগ্রেসই ১৯২১ সালে স্বরাজের পরিবর্তে স্বাধীনতা কথাটির ব্যবহারে আপত্তি তোলে। উপরন্তু ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে যখন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পরিবর্তে স্বাধীনতার দাবি কথাটি রাখার প্রস্তাব তোলা হয়েছিল, সেটিও তখন গ্রহণ করা হয়নি। মূলত এর প্রতিবাদেই মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাশ তখন পৃথক স্বরাজ্য পার্টি গঠনের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

সাধারণভাবে দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে যখন এমনই এক দ্বিধাগ্রস্ততা এবং সহিংস ও অহিংসের মধ্যে একধরণের নিত্যদ্বন্দ্ব প্রবল

তখন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লববাদীরা কিন্তু অনেকটা দূর এগিয়ে গেছেন। আগেই সামান্য উল্লেখ করেছি, ১৯১৭ সালের শেষে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের এক সভায় রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেটি সোভিয়েত সরকারের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সাত্তার খৈরী ও জব্বার খৈরীকে মস্কোয় পাঠানো হয়। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে লেনিনের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হয়। ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তাতে বৃটিশ-বিরোধী মুক্তি আন্দোলনে সোভিয়েত সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিল। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল, 'আমরা রাশিয়ার কাছে প্রার্থনা জানাই তাঁরা যেন আমরা যাতে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি তার জন্য সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেন। সারা পৃথিবীকে মুক্তি ও অধিকার অর্জন করতে সাহায্য করা রাশিয়ার কর্তব্য। মানচিত্রে তাকিয়ে দেখুন কোটি কোটি ভারতীয় আজ অন্যের পদানত। আপনাদের সাহায্য আমাদের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব করবে—এই আমাদের বিশ্বাস।' খৈরীরা সমাজতন্ত্রী নন, প্যান-ইসলামিস্ট ছিলেন, একথা পরে প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজদের মুসলিম ধর্ম-বিদ্বেষ ছিল এই উদ্যোগের প্রেরণা, এটাও স্বীকৃত। তবুও ঘটনাটি তাচ্ছিল্য করার মতো নয়।

১৯১৮ সালের মার্চ মাসে কাবুলে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী ভারত সরকারের রাষ্ট্রপতি মহেন্দ্র প্রতাপ পেত্রোগ্রাদে যান, পরের বছর যান ওই সরকারেরই প্রধানমন্ত্রী বরকতউল্লাহ। 'ইজভেস্তিয়ার' জনৈক সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে তিনি সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের অনুসৃত নীতির একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা উপস্থাপিত করেছিলেন। বরকতউল্লাহ বলেছিলেন যে তিনি কমিউনিস্ট বা সমাজতন্ত্রী নন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচী হলো এশিয়া থেকে বৃটিশ বিতাড়ন। তিনি কমিউনিস্টদের মতোই নিজেকে ইউরোপীয় পুঁজিতন্ত্রের আপসহীন শত্রু বলে মনে করেন এবং এই অর্থে কমিউনিস্টদের প্রবাসী বিপ্লবীদের সত্যিকার সহযোগী হিসাবে উল্লেখ করেন।[৪৩] অন্য একটি খবরে জানা যায়, ১৯১৯ সালের ৭ মে মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতুল্লাহ প্রমুখ লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সেখানে বরকতুল্লাহ লেনিনকে অনুরোধ করেন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করার জন্য। চিন্মোহন সেহানবীশ কিন্তু বলছেন,

বরকতুল্লাহর একটি সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয় পেত্রোগ্রাদ প্রাভদা পত্রিকায়। সেখানে বরকতুল্লাহ বলেন; ভবিষ্যতে ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যাবে এখনই তা বলা কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি জানি—সমস্ত জাতির কাছে রাশিয়ার সোভিয়েত সরকারের পুঁজিপতিবিরোধী (আর আমাদের কাছে পুঁজিপতি কথাটি বিদেশী, আরো নিখুঁতভাবে বলতে হলে বলা যায় ইংরেজের সমার্থক) সংগ্রাম চালানোর আবেদন প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে আমাদের উপরে। তার চাইতেও বড়ো ছাপ ফেলেছে রাশিয়া কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সমস্ত গোপন চুক্তির অস্বীকৃতি এবং যত ছোটই হোক জাতি মাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা। ঐ কাজটি সোভিয়েত রাশিয়ার চারিদিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এশিয়ার সমস্ত শোষিত জাতি ও পার্টিগুলিকে, এমন কি সে সব পার্টিকেও যারা রয়েছে সমাজতন্ত্র থেকে বহুদূরে। ঐ কাজ সুনির্ধারিত ও নিকটতর করেছে এশিয়ার বিপ্লব। ...বলশেভিকদের ভাবনা যাকে আমরা নাম দিয়েছি ইশত্রাকিয়াৎ—তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় জনগণের ভিতরে। ...ইতিমধ্যেই বছর খানেক ধরে অর্থনৈতিক ধর্মঘট ও প্রকাশ্য অভ্যুত্থান চলছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। বাংলাদেশই হলো সব থেকে বিপ্লবী অর্থাৎ বলতে গেলে বাংলা হলো বিপ্লবের মনন-কেন্দ্র আর সব থেকে কর্মচঞ্চল প্রদেশ হল পাঞ্জাব যার অবস্থান আফগানিস্তানের সীমানায়।

এরপর একাধিক ভারতীয় বিপ্লবী সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। যেমন দলীপ সিং গিল, ১৯১৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি নাগাদ। রহমত করিম এলাহি জাকারিয়া, ওই বছরেরই জুন মাসে। সেখানে তুর্কিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি বক্তৃতাও দেন। ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে মস্কোয় যান মৌলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি। ওই বছরেরই শেষে যান মুহম্মদ আলি, মুহম্মদ শফীক এবং আবদুল মজিদ। মুহম্মদ আলি পরে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কাজে যোগ দেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনেও অন্যতম উদ্যোক্তার ভূমিকা নেন।

এদিকে লণ্ডনে, পারীতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জর্মনীতেও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেন। ১৯১৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের যুগান্তর গোষ্ঠী সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য জর্মনী থেকে জাহাজে করে অস্ত্র আনার যে-পরিকল্পনা নেয় এবং সে-ব্যাপারে মূল দায়িত্ব যাঁকে দেয়

সেই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই অস্ত্র সরবরাহ প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নরেন্দ্রনাথ ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় পরে যে মেক্সিকোয় যান, সেখানে সোস্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন, মেক্সিকোয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন, রুশ নেতা বোরোদিনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং অতঃপর মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে ১৯২০ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে মস্কো যান—এখবর সকলেরই জানা। বার্লিনে তখন অবস্থান করছিলেন বার্লিন কমিটির নেতৃবৃন্দ, যেমন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করতেন), অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস হওয়ার কথা ছিল ১৯২০ সালের জুলাই মাসে। বার্লিন হয়েই মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সোভিয়েতে যান। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, গৌতম চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানাচ্ছেন, বার্লিন অবস্থানকালেই এঁরা 'ভারতীয় কমিউনিস্ট ইস্তাহার' নামে একটি নথি রচনা করেন এবং ১৯২০ সালের জুন মাসে গ্লাসগো সোস্যালিস্ট পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। গৌতম চট্টোপাধ্যায় আরও জানান, ওই নথিতে স্বাক্ষর ছিল মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শান্তি দেবী নামে মানবেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী এভলিন রায়ের।[৪৪] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে' এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা থেকে দুটি জিনিস বোঝা যায়, ওই ইস্তাহারের খসড়ায় বীরেন্দ্রনাথ (আলি হায়দার ছদ্মনামে) ও মানবেন্দ্রনাথের সই ছিল এবং ভূপেন্দ্রনাথ মতান্তরের জন্য ওই নথিতে সই করেননি। এবং দ্বিতীয়ত, এই নথি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিকের অধিবেশনের আগেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা এবং ওই তরফে আন্তর্জাতিকে যোগদান করা। ঘটনা এবং বিরোধ যাই ঘটুক না কেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের একটা উদ্যোগ যে ১৯২০ সালের মে-জুন মাসেই শুরু হয়েছিল এবং তার একটা ইস্তাহার রচিত হয়েছিল—এটা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অতঃপর এই তথ্যও আজ সকলেরই জানা যে, আন্তর্জাতিকের এই কংগ্রেসের পরেই তাসখন্দে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, সাত জনকে নিয়ে। এরা হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, এভলিন রায়, অবনীনাথ মুখার্জী, রোজা ফিটিংগফ, মুহম্মদ আলি, মুহম্মদ শফিক সিদ্দিকি এবং এম প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর আচার্য।[৪৫] ১৯২১ সালের

১ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ইস্তাহার। এতে স্বাক্ষর ছিল মানবেন্দ্রনাথ এবং অবনীনাথের। এবং এই ইস্তাহার পাঠানো হয় আহমেদাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে।[৪৬] ১৯২১ সালের ১৫ মে তারিখে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পত্রিকা The Vanguard of Indian Independence. পরে এর নাম পাল্টে হয় Advance Guard. এবং তারও পরে The Vanguard. ১৯২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে The Masses of India. ১৯২২ সালের জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল. সেটি এখানে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯২২ সালের ৫ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মস্কোয় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের যে-অধিবেশন বসে সেখানে যোগ দেবার জন্য এদেশের চারজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এঁরা হলেন স্বরাজ্য পার্টির নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র চিররঞ্জন দাশ, চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুভাষচন্দ্র বসু, এস এ ডাঙ্গে এবং নলিনী গুপ্ত। নলিনী গুপ্তকে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তার কোনোও প্রমাণ নেই। তবে তিনিই জানিয়েছিলেন যে তিনি ওই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। অন্য তিনজন যেতে পারেন নি।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই সব তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজনীয় ছিল এই কারণেই যে আমরা দেখেছি, এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯১৭ সালের পর প্রথাবাদীদের মধ্যে যেমন এক ধরণের দোদুল্যমানতা এসেছিল, ভীতিজনিত সঙ্কীর্ণতা মাথা চাড়া দিয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে রুশ বিপ্লবের আলোকে উত্তরোল হয়ে ওঠে জনমানস। একদিকে যেমন এই প্রথাবাদী অংশের তত্ত্বহীন, দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্বের জড়তা বারবার চরিত্রগত দিক থেকে এক রক্ষণশীলতার উন্মেষ ঘটাচ্ছিল জাতীয় আন্দোলনে. তেমনি পাশাপাশি দেশের মানুষ অধৈর্য হয়ে উঠছিল এক সুতীব্র আক্রমণ রচনার জন্য, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এই অধৈর্যেরই অন্যতম প্রকাশ প্রবাসে বিপ্লবী সমিতি এবং সংগঠন গড়ে তোলা, বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনার উদ্যোগ। কিন্তু এই সমগ্র পরিস্থিতির এটাই উল্লেখযোগ্য দিক বলতে হবে যে, এই বিপ্লবীরা সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসে অনেক বেশি বাস্তববাদী, সুশৃঙ্খল এবং তত্ত্বসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করেন। এবং অবশেষে

কমিউনিস্ট পার্টির মতো বিপ্লবী-তত্ত্বভিত্তিক একটি দল গঠন করেন। ভূপেন্দ্র-নাথ দত্ত যখন লেনিনকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্কের ওপর একটি সমীক্ষা পাঠান, তখন লেনিন জবাবে বলেন, শ্রেণী সম্পর্কের কথা থাক, কৃষক আন্দোলনের ওপর তথ্য সংগ্রহ করুন। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত-নির্ভর (কংগ্রেস যা করেছিল বা করতে চেয়েছিল) হয়ে থাকলে চলবে না, জোর দিতে হবে শ্রমিক, এবং অবশ্যই কৃষকদের ওপর। এইভাবেই এক অগোছালো বিপ্লবী চেতনা সুশৃঙ্খল বিপ্লবী আদর্শে রূপান্তরিত হতে থাকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের মধ্যে দিয়ে এবং এই কমিউনিস্ট পার্টি গঠন কিছুদিন বাদে এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের প্রসারকে ত্বরান্বিত করে। কার্যত বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে আপোষকামী এবং আপোষবিরোধীদের মধ্যে যে লড়াই বাধে, যা চিহ্নিত হয় দক্ষিণ এবং বামপন্থার রাজনৈতিক সংঘাত হিসেবে এবং চলতে থাকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত, তার পেছনে নভেম্বর মহা-বিপ্লবের সংঘটনা, সশস্ত্র বিপ্লবের সাফল্য এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের স্ফূর্তি অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। ১৯২২ সালের ২৫ অক্টোবর তারিখে আত্মশক্তি পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে সরাসরিই ঘোষণা করে: চাই একটি নতুন দল। এই নিবন্ধে বলা হয়: অসহযোগ আন্দোলন চুপচাপ হয়ে গেছে। বুড়োরা যা ভাবেন তা মুখ ফুটে বলেন না…ছেলেদের মনে ক্রমে অন্য আশা, অন্য আদর্শ জাগছে। …সুখের কথা দেশে আর একটা দল গড়ে উঠেছে, সেটা শ্রমিকের দল, কুলি মজুর চাষাভূষোর দল। …তারাও শত্রু মিত্র চিনছে, তারাও সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এ স্বাধীনতা সংগ্রামে সবাই হয়ত নিজের পুঁটুলি বাঁচাবার চেষ্টা করছে। …কিন্তু এই কুলি মজুর চাষার দলের পুঁটুলি নেই। লড়বার মত একটা আদর্শ আর একজোটে কাজ করবার শক্তি যদি এরা পায় তাহলে অসাধ্য সাধন করবে। এরাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।

এই ভাবেই মহাবিপ্লবের ঢেউ প্লাবিত করে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতাকে। উল্লেখ্য, আত্মশক্তি পত্রিকা ছিল জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থা ঘেঁষা অংশের অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখদের নবগঠিত দল স্বরাজ্য-পত্রিকার মুখপত্র। ডঃ মলয় বসু অত্যন্ত সত্যি কথাই বলেছেন যে সেই সময়ে কমিউনিস্ট আদর্শ অনুসারী যে দল গড়ে উঠছিল তাকে আত্মশক্তির স্বাগত-

জানানো এক আশ্চর্য উদারতা। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও জানাচ্ছেন, সারা দেশে আত্মশক্তি পত্রিকাই প্রথম লেনিনের ছবি ছাপায়, ১৯২৮ সালে।

মুহম্মদ জাহাঙ্গীর লিখেছেন, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতবুদ্দীন আহমদ ও শামসুদ্দীন হোসেন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় একটি পার্টি গঠন করলেন। তার নাম হয় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবার স্বরাজ পার্টি।[৪৭] এই পার্টির মুখপত্র রূপে লাঙল সাপ্তাহিক কাগজ বার হয়। —১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে লাঙল-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ...লাঙলের প্রধান পরিচালক হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম লেখা হতো, আর সম্পাদকরূপে নাম ছাপা হতো মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের।[৪৮] লাঙলের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুলের সাম্যবাদী কবিতা। দ্বিতীয় সংখ্যায় কৃষকের গান। তৃতীয় সংখ্যায় সব্যসাচী। লাঙল পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে লেখা থাকতো: শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

কল্পতরু সেনগুপ্ত কিন্তু একটু ভিন্ন তথ্য দিচ্ছেন: ১৯২৩ সালে মুজফফর আহমদকে কানপুরে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৫ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তির পরে কলকাতায় এলে লাঙল সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। এই পত্রিকা শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। পরে এই দলের নাম হয়েছিল ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেণ্টস্ পার্টি অব বেঙ্গল। এই নামেই তখন কমিউনিস্টরা সংগঠিত হচ্ছিল। তাই লাঙলই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র। সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম।[৪৯]

বলা বাহুল্য, এখানে তথ্যের কিছু বিভ্রম ঘটেছে, সম্পাদক সংক্রান্ত। তবে কল্পতরু সেনগুপ্ত ঠিকই জানান যে এই লাঙল পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে বেরোতে থাকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ করা ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার। এছাড়া বেরোয় মুজফফর আহমদের শ্রেণীসংগ্রাম, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন, কুতুবুদ্দীন আহমদের কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা, ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট কনফারেন্স—কানপুর, প্রভৃতি রচনা।[৫০] ১৯২৬ সালের ২৮ জানুয়ারি লাঙল পত্রিকা লেখে: একটি মাত্র জিনিস, কমিউনিজম আজ ভারতবর্ষকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারে। কমিউনিস্টরা মনুষ্যত্বটাকে বড় বলে মানে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় তারা একেবারেই দেয়না। তারা ধনিকগণের

লোভ লোলুপতার অবসান করে দিতে চায়। সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার আয়ত্ত করে, সর্ব সম্পদ ও উৎপাদিত যাবতীয় সামগ্রী জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং উৎপাদন ও বণ্টনের সুব্যবস্থা করে কমিউনিস্টরা জগতে স্থায়ী শান্তি আনয়ন করবে।

মুহম্মদ জাহাঙ্গীর লিখেছেন ১৯২৬ সালের ১৫ এপ্রিল লাঙলের সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তারপর ১২ আগস্ট থেকে এই পত্রিকাই প্রকাশিত হয় গণবাণী নামে। সম্পাদক হন মুজফফর আহমদ। গণবাণীতে উল্লেখ করা থাকতো: 'একসাথে লাঙল একীভূত হয়েছে।' কিন্তু দেখা যাচ্ছে ১৯২৬ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে গণবাণী প্রকাশিত হয়েছে। গণবাণীর প্রথম পৃষ্ঠায় ওপরে লেখা থাকতো, দুনিয়ার মজদুর এক হও। আর নীচে লেখা থাকতো বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দলের মুখপত্র। ১৪ এপ্রিলের ওই সংখ্যায় গণবাণী লিখছে: রুশের বিপ্লবের ফলে সমগ্র জগতে একটা গণ চৈতন্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের যে শক্তি ছিল সে শক্তি এখন আর নেই। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের পদানত হয়ে আছে। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম দেশীয় ধনিক বণিকদের হাত করে দেশের জনসাধারণকে নির্দয়ভাবে শোষণ করছে। এই শোষণের হাত এড়াবার জন্য আমাদের সর্বপ্রথমে প্রয়োজন হবে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। ...কংগ্রেস, ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। ....কংগ্রেসের মাথার ওপর যাঁরা বসে আছেন তাদের সহিত ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের একটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অবস্থা আরও শোচনীয়। এর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক সংঘগুলো শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ···এই সকল কারণে একটা নতুন রাষ্ট্র-নৈতিক দল গঠন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই দল জনগণের দল, আমরা এর নাম দিয়েছি কৃষক ও শ্রমিক দল।

লাঙল এবং গণবাণী এক হয়ে গেলেও এবং মোটামুটি একই ভাবনা চিন্তার ফসল হলেও সময়ের অবস্থানে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরা পড়ে। যেমন ১৯২৬ সালের ৭ জানুয়ারি লাঙল পত্রিকায় লেখা হলো: কৃষক ও শ্রমিককে সংঘবদ্ধ না করে তাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকারে সচেতন না করে আর আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়। পণ্ডিত মতিলালের মতলব

দেশের লোককে চমক লাগিয়ে দিয়ে ফিরে ইলেকসনে আবার দল বেঁ কাউন্সিলে প্রবেশ করা? কিন্তু অতঃপর? মহাত্মার এক বছরের ধরাক্কে ধাক্কা এখনও আমরা সামলাতে পারিনি, আর চমক লাগাবার প্রয়োজ কি? পণ্ডিতজীর রেজোলিউসন পড়ে আমাদের মনে হয় সেই লোকটি জলে ডোবার কথা। সে সংসারের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে বিরক্ত হয়ে জলে ডুবে মরবে বলে ঠিক করল। কিন্তু ঘাটে যাওয়ার আগে গামছাখানি ও তেল চাইল। তেল মাখা ও গামছার কথা যে না ভুলেছে, সে যে জলে ডুবে মরবে না এটা বেশ বোঝা যায়। ...বৎসরান্তে কানপুরে আমাদে পলিটিক্যাল চড়ক পূজা শেষ হল। ফিরে এসে দুই একজন বাদে নেতার ওকালতি, ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারী এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে মন দিবেন এবং যিনি বড় দয়ালু সপ্তাহান্তে হয়তো এক একবার দেশ উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন। কই দেশবন্ধুর মতো সেই সর্বগ্রাসী দেশপ্রেম, কই সেই জ্বালা—আজ রাজনীতিক্ষেত্রে কেবল ফাঁকিবাজী, সঞ্চিত ধনের গাদায় বসে, অথবা পাবলিক ফাণ্ডের অপহরণে, অথবা প্রজার রক্ত শোষণ করে যে নিশ্চিত আছে, আজ তারই নেতাগিরির দিন।[৫১]

অন্যদিকে এর কিছুদিন পরেই লাঙল-এর পরিবর্তিত সংস্করণ গণবাণী লিখছে: বর্তমান অবস্থায় প্রতিনিধি হইয়া যাওয়া মানে গভর্ণমেণ্টের চাকের বাঁয়া হইয়া যাওয়া। আর যদি সাধারণ নির্বাচন চক্র হইতে আইন সভায় প্রবেশ করিয়া শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ লইয়া যুঝা যায়, তবে সেটা যে কেবল ব্যর্থ হয় তাহা নয়, যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া যাওয়া তাহাদেরই স্বার্থের বিরোধী হইতে হয়। অথবা শ্রীযুক্ত 'তুলসী গোঁসাই' অথবা দেওয়ান 'চমন লালের মত' লেবর লীডার হওয়া হয়। শ্রমিক কৃষক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলিয়া বর্তমান নেতাগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা চান শতকরা আড়াইজনের ভাঁবেদারী করিয়া নাবালক শ্রমজীবীরা রাজনৈতিক অধিকারের যোগ্যতা অর্জন করিবে। দেশের জন্য যারা অকাতরে জেলে যায়, ফাঁসীকাঠে ঝোলে তাঁহারাও এই মতাবলম্বী। জনগণের অভ্যুত্থানের দিনে ইহারাই বিপ্লবের পরিপন্থী হইয়া উঠিবে এবং এখন হইতেই সেই লক্ষণ বেশ বুঝা যাইতেছে। আর দেশীয় ধনিক সম্প্রদায় তো ফ্যাসিস্ট হইয়া উঠিয়াছেন। কংগ্রেসের দলে ভর্তি হইয়া নিজেদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ পরিরক্ষণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; আর কংগ্রেসের নীতিও এই

সিদ্ধির অনুকূলে বেশ নিরাপদ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহারা ইংরেজের নিকট এখনও ভারতের জনসাধারণের নামে কথা কন এবং শ্রমিক কৃষকরূপী হরিণের মাংস খাইবার যে তাঁহাদেরই একমাত্র অধিকার এই দাবী প্রতিষ্ঠায় লড়িতেছেন। যেহেতু ব্যাঘ্ররূপী ধনিকগণ ভারতের সুন্দরবনে একই স্থানে ঐ হরিণগুলির সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহারা একই মায়ের সন্তান, সেজন্য বিদেশী ব্রিটিশ সিংহকে খাইবার অধিকার তাঁহারা দিতে রাজী নন। ইহাই ভারতের বর্তমান রাজনীতি। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যত নেতার উদ্ভব হয়েছে সকলেই বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক। তাঁহারা যতই ত্যাগ করুন, যতই ক্লেশ স্বীকার করুন সঙ্কটকালে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের সমর্থন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে করিয়াছেন। বণিক গুরু মহাত্মা গান্ধী ধনিক গুরু পণ্ডিত মালব্য বা ইংরাজী শিক্ষিতের গুরু সি আর দাস সকলেই এক আদর্শের ভজনা করিয়াছেন। নিজের জমিদারী বা কল না থাকিলেও জমিদার বা কলওয়ালায় হইয়া মহাত্মা গান্ধী প্রজা ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে গিয়াছেন। পণ্ডিত মালবীয় ধর্মের দোহাই দিয়া ধনিকতন্ত্রের শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য হিন্দুসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও ধনীর মুখ চাহিয়া শেষ জীবনেও কাজ করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী জনসাধারণের মন একসময়ে অধিকার করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কার্যতালিকা বিপ্লবমূলক ছিল। ট্যাক্স বন্ধ ও আইন অমান্যে জনসাধারণের দাবী নিহিত ছিল এবং উপাধি, ইস্কুল, কলেজ, আদালত, কাউন্সিল প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় অগ্রসর হইবার ডাকে সত্যিকার একটা ভিত্তি ছিল। এই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করাইতে গিয়া যখন উচ্চ শ্রেণীসমূহের অসামর্থ প্রমাণিত হইল, তখন দেশের জনসাধারণ অসহযোগ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। বিক্ষিপ্ত সেনানীগণকে একত্র করিবার চেষ্টায় চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্যদল গঠন করিলেন। তাহার একটা দূর লক্ষ্যও ছিল যে ভবিষ্যতে জনসাধারণের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন করা। কিন্তু সে লক্ষ্য মরীচিকায় পরিণত হইল। বুর্জোয়া শ্রেণী চিত্তরঞ্জনের আন্দোলনে নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থের পরিপুষ্টির সুযোগ দেখিয়া গান্ধীর আন্দোলন ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্য দলে যোগ দিল। কাউন্সিলে ঢুকিলেই আদালত, ইস্কুল, কলেজে ঢোকার আর বাধা হইবে না—অনেকেই ইহা বেশ বুঝিলেন। ক্রমশঃ মডারেট, ধামাধরা প্রভৃতির অনেকেও মুখোস পরিয়া স্বরাজী হইলেন।

যাঁহারা চিত্তরঞ্জন বাঁচিয়া থাকিতে কংগ্রেসের চাবি আনার মেম্বার হয় নাই, তাঁহারাই চাঁই হইয়া দাঁড়াইল। অসহযোগের বৈশাখী ঝড়ের দিনে যাঁহারা কোন গর্ত্তে লেজ গুটাইয়া লুকাইয়া ছিলেন—তাঁহারাও দেশের নেতা হইয়া শরতের আগমনে দেখা দিলেন। তাই চিত্তরঞ্জন 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হইলেন—তাই মরিয়াও তিনি বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের এত প্রিয়। বিপ্লবের ধারাকে তিনি কাউন্সিলের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া নিরাপদ করিয়া দিয়াছেন। সমগ্র দেশের নামে কথা কহিবার জন্য তিনি পল্লী সংস্কারের ধূয়া তুলিয়া গিয়াছেন—তাই তিনি আজ এত পূজার সামগ্রী। ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার চরম আদর্শকে তিনি কাজে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই—তাঁহার নূতন রংরুটেরাই তাহা করিতে দিত না। চিত্তরঞ্জনের অকাল সমাধির জন্য ইহারাই দায়ী। শতকরা আড়াইজনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন। তাই তিনি গণ-স্বরাজের কাজে হাত দিতে পারেন নাই। তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত পলিটিক্যাল মোহান্তগণ এখন সেই নীতি প্রাণপণে আঁকড়িয়া আছেন। কিন্তু 'বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো' যে কত বড় সত্যি কথা তাহা নির্যাতিত শতকরা ৯৭॥০ জনের আন্দোলন শীঘ্রই প্রমাণ করিয়া দিবে।[৫২]

মাত্র দেড় বছরের ব্যবধানে লাঙল ও গণবাণীর সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পরিবর্তন বিস্ময়কর। এ ভি রাইকভ একটি নিবন্ধে এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেছেন। রাইকভের মতে, ১৯২২ সাল থেকেই চৌরিচৌরার ঘটনায় অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার কারণে গান্ধী তথা কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতের বিপ্লববাদী সংগঠনগুলির ক্ষীণ মৈত্রীটুকুও নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে তারা আবার গুপ্ত সংগঠনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে থাকে। রাইকভ লিখছেন: গুপ্ত সংগঠনগুলির পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়াটি ছিল স্ববিরোধী। প্রথম নজরে মনে হবে পরিস্থিতি ছিল বিপ্লবীদের অনুকূল: জাতীয় শিবিরে মতপার্থক্য, কংগ্রেসের মর্যাদা অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল এবং মনে হচ্ছিল কংগ্রেস ও গান্ধীর বিরোধী সকলেরই আকর্ষণের কেন্দ্র হবে গুপ্ত সংগঠনগুলি। অবশ্য ভারত সে সময় অনেক বদলে গিয়েছিল। ব্যাপক জনগণ রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নিতে শুরু করেছিলেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন হয়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী উপাদান। দেশে মার্কসবাদের প্রচার হচ্ছিল, লেনিন

ও রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথম কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল এবং ইওরোপে অবস্থানকারী দেশত্যাগী ভারতীয় বিপ্লবীরা মার্ক্সবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। বিপ্লবীদের এই পরিবর্তনকে খেয়ালের মধ্যে রাখতে হয়েছিল। ১৯১৯—২২ কালপর্বে আহরিত গণ সংগ্রামের অভিজ্ঞতাও বৃথা যায়নি। এরূপ অবস্থায় বিপ্লবীরা আবছা আবছা অনুভব করেছিলেন যে ষড়যন্ত্র ও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পূর্বতন সেই কর্মকৌশলে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তবুও পরিবর্তন ছিল মন্থরগতি, কারণ গুপ্ত সংগঠনগুলির সামাজিক ভিত্তি আগেকার মতই ছিল শহরের পেটি বুর্জোয়া অংশগুলি, যারা জনগণের মধ্যে একটানা কাজ করতে অপারগ ও যারা অধৈর্য। ....কাজকর্ম সবার আগে পুনরায় শুরু করেছিলেন বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা। এদের পেছনে ছিল দীর্ঘকালের ঐতিহ্য। পুনরায় সক্রিয় হলো অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর। এ দুটি ছাড়া অন্যান্য গ্রুপেরও আবির্ভাব ঘটলো। স্বদেশী ডাকাতি ও ব্রিটিশ অফিসারদের প্রাণনাশের চেষ্টার সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হতে লাগল। যদিও মনে হচ্ছিল গুপ্ত সংগঠনগুলি পুরনো ফর্ম ফিরে পেয়েছে আসলে তা কিন্তু ছিল না। উপরে বর্ণিত উপাদানগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এইসব সংগঠনের উপর পড়ছিল যা এদের কার্যকলাপে এমন নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করছিল যেগুলি থেকে এই সংগঠনগুলির বিবর্তন ও বিকাশে গুণগতভাবে এক নতুন স্তরের কথা বলা সম্ভব। ...কুড়ির দশকের মাঝামাঝি ভারতে এমন সব ঘটনা ঘটল যেগুলি গুপ্ত সংগঠনগুলির সদস্যদের মার্ক্সবাদে আগ্রহের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এগুলি হলো কানপুর ষড়যন্ত্রের মামলা, কমিউনিস্ট পার্টির কনস্টিটুয়েন্ট কনফারেন্স, শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকদের আন্দোলনের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জনপ্রিয়তার অধিকতর বৃদ্ধি। এর ফলে গুপ্ত সংগঠনগুলিতে ভাঙন ক্রমশই বাড়ছিল। ১৯২৬ সনে অনুশীলন সমিতির একদল সদস্য সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দেন যে তাঁরা এই নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। ...এর পর গোপেন চক্রবর্তী ও তাঁর বন্ধুরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হন। ১৯২৭ সাল নাগাদ গোটা গ্রুপটি বাংলার ওয়ার্কার্স ও পেজেন্টস পার্টিতে যোগ দেন। যুগান্তর দলেও একই প্রক্রিয়া ঘটেছিল এর নতুন নেতা জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় কমিউনিস্ট শওকত

উসমানির সঙ্গে সাক্ষাত করেন। উসমানি আগে মস্কো গিয়েছিলেন। আবার যখন তিনি কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে যোগ দিতে মস্কো যান তখন চিঠিপত্র লেখার জন্ম যুগান্তর নেতার গোপন ঠিকানা নিয়ে গিয়েছিলেন। ছোট আর একটি গুপ্ত দলের নেতা আবদুর রেজাক খানও ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং ঘোষণা করেন তাঁদের দলটি কমিন্টার্নের কর্মসূচী মেনে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই কর্মসূচী অনুসারেই নিজেদের কাজকর্ম গড়ে তুলবে।[৫৩]

পরিস্থিতির এই পরিবর্তন লাঙল এবং গণবাণীর লেখায় খুবই স্পষ্ট। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পত্রিকার প্রতিবেদনে কতগুলি লক্ষ্যণীয় দিক ফুটে উঠেছে। যেমন জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান ও এই ধরণের আন্দোলনে তাদের ভূমিকা এবং তুলনায় শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার গুরুত্ব, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সমগোষ্ঠীভুক্ত নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের রাজনৈতিক ভাবনার বিভিন্ন দিক, বিশেষত তদানীন্তন পরিস্থিতিতে, এবং এসম্পর্কে মোহমুক্তি—এগুলি খুবই স্বচ্ছ হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। তাছাড়া আরও লক্ষ্যণীয়, শ্রেণী সংগ্রাম, বুর্জোয়া শ্রেণী, ফ্যাসিস্ট ইত্যাদি শব্দগুলির রাজনৈতিক ব্যবহারও ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। এসবই ঘটেছিল বোধের এবং আদর্শের একটি নির্দিষ্ট উত্তরণে এবং তার প্রায়োগিক অর্থাৎ সাংগঠনিক স্তরে এসে।

লাঙল এবং গণবাণীর বিষয়সূচী বিষয়টিকে আরও সরল করবে। ১৯২৬ সালের ৭ জানুয়ারির লাঙলের সূচী ছিল: ১. কাজী নজরুলের সব্যসাচী। ২. পলিটিক্যাল তুবড়ীবাজী (সম্পাদকীয় নিবন্ধ)। ৩. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে ম্যাক্সিম গোর্কির মা। ৪. শেকভের ভাব অবলম্বনে নাগরিক—শ্রীইন্দ্রজিৎ শর্মা। ৫. খবরদারী—আগে পিছু অহিংস গুণ্ডামী, মহাবীর সম্বর্ধনা, মহাত্মার ভোট, অ-রাম বা অ-রাবণ হবে ধরা আজি, পাদপূরণ। ৬. প্রজাসত্ত্ব আইন—প্রজার কথা। ৭. খড়কুটো। ১৪ জানুয়ারির লাঙলের সূচী: ১. রাখালী—জসীমউদ্দীন। ২. ভারত কেন স্বাধীন নয়—মুজফফর আহমদ। ৩. লেনিন ও সোভিয়েত রুশিয়া—দেবব্রত বসু। ৪. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে ম্যাক্সিম গোর্কির মা। ৫. খবরদারি—পরলোকে জগদিন্দ্রনাথ, চীন সরকারের ভোজ, কথার

ব্যবসায় ছিদ্র কোথায়। ৬. খড়কুটো—বীরভূম প্রজা সম্মেলন, হাওড়া জিলা প্রজা সম্মেলন। ৭. ভারতীয় প্রথম কম্যুনিস্ট কনফারেন্স কানপুর [ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির গঠন নীতি]। বগুড়া জেলা প্রজা কনফারেন্স। ১৯২৬ সালের ২১ জানুয়ারি লাঙলের যে সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় তার নাম দেওয়া হয়েছিল সুভাষচন্দ্র সংখ্যা। কংগ্রেস দলের মধ্যে আপোষবিরোধী নেতা হিসেবে ক্রমশ পরিচিত হয়ে ওঠা সুভাষচন্দ্র বসুকে একটি সংখ্যা উৎসর্গ করা রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই সংখ্যার সূচী: ১. জন্মোৎসব (সম্পাদকীয় প্রতিবেদন বলা চলে)। ২. দেশভক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। ৩. সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী। ৪. দেশবন্ধু সম্বন্ধে—সুভাষচন্দ্রের চিঠি। ৫. নজরুল ইসলামের পত্র। ৬. কমিউনিজম ও বলশেভিজম—সাম্যবাদী সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ। ১৯২৬-এর ২৮ জানুয়ারির সূচী: ১. গাড়োয়ানের গল্প (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ২. সুভাষচন্দ্রের বিলাতের পত্রাবলী। ৩. লেনিন ও সোভিয়েট রুশিয়া—শ্রীদেবব্রত বসু। ৪. কোথায় প্রতিকার—মুজফ্ফর আহমদ। ৫. ময়মনসিংহ জেলার কৃষক সম্মিলন, নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মিলন, ২য় অধিবেশন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ৬. খবরদারি—পরলোকে দ্বিজেন্দ্রনাথ, মুসাবত, মহাত্মাজীর পীড়া। চাঁদা দিয়ে হিসাব চাওয়া, কম্যুনিস্ট ও স্বরাজ্য দল। ৭. খড়কুটো। ৮. মা—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৬-এর ৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় নিয়মিত বিষয়গুলি ছাড়া দেখতে পাই দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ: হৃষিকেশ সেনের বাংলায় প্রজাসত্ত্ব বিষয়ক বিধি এবং কুতুবউদ্দীন আহমদের কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা। একইভাবে ২৫ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় দেখতে পাই তিনটি উল্লেখযোগ্য রচনা: ম্যাক্স বিয়ারের সোস্যালিজম কাকে বলে, চীনের নবজন্ম (লেখকের নাম নেই) এবং মুজফ্ফর আহমদের শ্রেণী সংগ্রাম। ১৮ মার্চের সংখ্যায় ছিল কার্ল মার্ক্সের রচনা, ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষের একটি চিত্র, এবং সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরাজ্য দল।

১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি সংখ্যায় ভারতীয় প্রথম কম্যুনিস্ট কনফারেন্স—কানপুর নামে যে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটি প্রকাশ করা হয়েছিল এইভাবে: যেহেতু দেশীয় ও বৈদেশিক ধনিকগণের দ্বারা এবং ভারতীয় জমিদারগণের শোষণ বৃত্তির দ্বারা ভারতবর্ষের শ্রমিক ও কৃষকগণ মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারিতেছে না, যেহেতু ভারতের বর্তমান

রাষ্ট্রীয় দলসমূহে বুর্জুয়া (অভিজাত)দেরই সমধিক প্রভুত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে আর এই প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকগণের উন্নতির পরিপন্থী, সেই হেতু ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণের এই সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছে যে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মুক্তির জন্য একটি দল গঠিত হউক। এই দল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (Communist Party ot India) নামে অভিহিত হইবে। এই দলের চরম উদ্দেশ্য হইবে ভারতে কৃষক ও শ্রমিকগণের সাধারণতন্ত্র (স্বরাজ) প্রতিষ্ঠা করা। ভূমি, খনি, গৃহ, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে ইত্যাদি যে সমস্ত জনসম্পদের উপর জন-সাধারণের অধিকার স্থাপিত হওয়া উচিত সেই সম্পদকে সর্ব্বাধিকারভুক্ত ও সর্ব্বনাগরিকের আয়ত্ত করিয়া ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মানুষের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ব্যবস্থা করা কম্যুনিস্ট পার্টির সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য হইবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের জন্য এই পার্টিকে সহর ও মফস্বলে শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে, ডিস্ট্রিক্ট ও তালুক বোর্ড ম্যুনিসিপ্যালিটি ব্যবস্থাপক সভাসমূহে লোক প্রেরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ অন্যান্য উপায় ও প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এখন যেসকল রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ রহিয়াছে এই পার্টি তাহাদের সমবায়ে বা তাহাদিগকে বাদ দিয়া কাজ করিবে। এই পার্টির একটি কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় থাকিবে, কার্য্যালয়ের কাজ চালানর জন্য বর্ত্তমানে এক বা দুইজন সেক্রেটারী থাকিবেন। সম্মিলনের সভাপতি আগামী বর্ষে অন্য সম্মিলন হওয়া পর্যন্ত এই পার্টির সভাপতি থাকিবেন। কেবলমাত্র কম্যুনিষ্টগণই এই পার্টির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন। তাহাদিগকে পার্টির উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। কোনো সাম্প্রদায়িক সভ্য বা সংগঠনের সভ্য এই পার্টির সভ্য হইতে পারিবেন না। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস বা সম্মিলনের অধিবেশন বৎসরে একবার করিয়া ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হইবে। ...ইংলণ্ডে যে সকল কম্যুনিষ্ট কারারুদ্ধ হইয়াছেন, সম্মিলন তাহাদিগকে সমবেদনা জানাইতেছেন এবং ইংলণ্ডের সরকারের এরূপ ব্যবহারের প্রতি বিরক্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে। বৃটিশ পার্লামেন্টের কম্যুনিষ্ট ও ভারতীয় সদস্য মিঃ সাকলাৎওয়ালাকে যে আমেরিকাতে যাইতে দেওয়া হয় নাই তৎপ্রতিও সম্মিলন বিরক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। নিম্নলিখিত ভারতীয় কমিউনিস্টগণের কারাবরণেও সম্মিলন সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে : ১. মোহম্মদ আকবর খান (১০ বৎসর, এখনও কারাগারে)। ২. গওহর রহমান

(২ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৩. মির্জা আকবর শাহ (২ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৪. সৈয়দ মোহম্মদ হানীব (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছে)। ৫. আবদুল মজীদ (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৬. রফিক আহমদ (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৭. ফিরোজ দীন (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৮. মোহম্মদ সুলতান (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)। ৯. শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে (৪ বৎসর, এখনো কারাগারে)। ১০. মোহম্মদ সওকৎ উসমানী (৪ বৎসর, এখনও কারাগারে)। ১১. নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত (৪ বৎসর, পাকস্থলীতে সাংঘাতিক ক্ষত হওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে)। ১২. মুজফফর আহমদ (৪ বৎসর, যক্ষা রোগাক্রান্ত হওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে)। ১৩. মোহম্মদ শফীক (৩ বৎসর, এখনো কারাগারে)।

লাঙল-এর প্রতিষ্ঠা এবং গণবাণী-র বিকাশ যে রুশ বিপ্লবের দুই ইস্তাহার ইসক্রা এবং পরে প্রাভদা-র আদর্শেই ঘটেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিপ্লবের জন্য চাই বিপ্লবী পার্টি এবং বিপ্লবী পার্টির জন্য যে বিপ্লবী মুখপত্র প্রয়োজন এই ধারণা গড়ে উঠতে এদেশে দেরি হয়নি। লাঙল-এ প্রকাশিত সংবাদ থেকেই আমরা জানতে পারছি, ওই সময়েই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় উর্দু পত্রিকা মুসাবৎ এবং কানপুর থেকে হিন্দি পত্রিকা সাম্যবাদী। তার আগেই বোম্বাই থেকে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে প্রকাশ করেন দ্য সোস্যালিস্ট পত্রিকা। এবং সমসাময়িক সময়ে পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত হয় কীর্তি-কিষান পত্রিকা। এদের প্রত্যেকের কণ্ঠস্বরই একরকম, ভাবনাচিন্তা একই আদর্শে পরিচালিত, তা হলো, শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার ঘটানো এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা।

এই প্রসঙ্গে সংহতি মাসিক পত্রিকাটির উল্লেখ প্রয়োজনীয়। লাঙল পত্রিকাটি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছেছিল সে-তথ্য আমরা পাই বিপ্লবী প্রমথনাথ দত্ত ওরফে দাউদ আলী দত্ত-র পাঠানো একটি চিঠিতে। ১৯২৬ সালের ১০ আগস্ট তারিখে লেখা এই চিঠিতে দাউদ আলী লেখেন, লাঙল ই ভারতের বঞ্চিত সম্প্রদায় বা প্রলেতারিয়েতের প্রথম মুখপত্র। ডঃ মন্মথ বসু এ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে লাঙলের নয়, এই সম্মান সংহতি পত্রিকার প্রাপ্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর উক্তি তুলে দিয়ে তিনি বলছেন, এর আগেই শ্রমজীবীদের জন্য একটি পত্রিকা করার উদ্যোগ

নিয়েছিলেন জীতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার ছাপাখানার একজন কর্মী। শ্রমজীবীদের জন্য এটাই প্রথম পত্রিকা।[৫৪] এখানেও বোধহয় কিছু বিভ্রান্তি থেকে গেছে। সংহতির বহু বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল ভারত শ্রমজীবী পত্রিকা। সেটাও ছিল শ্রমজীবীদের জন্য কাগজ, থাকতো শ্রমজীবীদের কথা। কেউ কেউ দাবি করে থাকেন, এদেশে শ্রমজীবীদের জন্য (অর্থান্তরে শ্রমিকদের) সেটাই প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা। আসলে এটা বোধ হয় বোঝা দরকার, সংহতি যে-সময়ে প্রকাশিত হয় (১৯২৩ সালে) তখন এই ধরণের উদ্যোগ ছিল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যখন দেখি তাতে প্রকাশিত হচ্ছে শ্রমিকদের সম্পর্কে আলোচনা, মজুরদের গান, কৃষকদের নিয়ে কবিতা, আসামে কুলি চালান নিয়ে প্রতিবেদন ইত্যাদি। কিন্তু এর সুসংবদ্ধ কোনো রাজনৈতিক আদর্শগত ভিত্তি ছিল না। বিশেষত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে। সংহতি পত্রিকায় মুক্তি আন্দোলনের ভাবনা নির্ভর যে ঘাটতি ছিল তা কিছুটা পূর্ণতা পায় লাঙলে, এবং আরও পরিণত হয়ে ওঠে গণবাণীতে।

মহাবিপ্লবের ঢেউয়ে প্লাবিত এদেশের চেতনায় এই পরিবর্তনের পটভূমিতে কমিউনিজমের ছায়ায় যখন গড়ে উঠছিল এক স্বতন্ত্র সাংবাদিকতা তখন অন্যান্য সংবাদপত্রের অবস্থানের দিকে তাকানোও সমান প্রয়োজনীয়।

চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় বাংলার কথা (সাপ্তাহিক) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদী ভাবনায় পল্লবিত এই পত্রিকাটিতে কাজী নজরুল ইসলামও লিখেছিলেন দু-একবার। পত্রিকাটি দৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯২২ সালের ৮ ডিসেম্বর। সম্পাদক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র কিছুটা আপোষ-বিরোধী, কিন্তু প্রথাবাদের বিরুদ্ধে নন। ফলে এখানেও ছিল জাতীয়তা-বাদের তীব্র স্বর। বাংলার কথা তার কিছুদিন পরেই বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি দৈনিক ফরওয়ার্ড-এরই অনুষঙ্গ হিসাবে। যদিও তার আগেই স্বরাজ্য দলের মুখপত্র আত্মশক্তি প্রকাশিত হয়, যার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৯২৯ সালে ফরওয়ার্ড পত্রিকা নামান্তরিত হয় লিবার্টি-তে, বাংলার কথা বঙ্গবাণী-তে এবং আত্মশক্তি নবশক্তি-তে। লিবার্টি ফের ফরওয়ার্ড নামে প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ থেকে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রে

এরপর সংযোজন ঘটে, ১৯৩৬ সালে আকরম খাঁ প্রতিষ্ঠিত আজাদ, ১৯৩৭ সালে অমৃতবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর যুগান্তর, ১৯৩৯ সালে মাখনলাল সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত, ওই বছরেই কৃষক প্রজা পার্টির প্রকাশিত কৃষক, এবং ১৯৪৬ সালে এইচ এস সোহরাওয়ার্দি প্রতিষ্ঠিত ইত্তেহাদের।

এইসব পত্রিকার মধ্যে ফরওয়ার্ডগোষ্ঠীর কাগজগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় একটু ভিন্নতর ভূমিকা নিয়েছিল। ২৭-২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট নিয়ে বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন গতি পাওয়ায় ফরওয়ার্ড, বঙ্গবাণী এবং নবশক্তির কণ্ঠস্বর আরও জঙ্গী হয়ে ওঠে। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বঙ্গবাণী বা নবশক্তির তুলনায় ফরওয়ার্ড অনেক বেশি সংবাদ প্রকাশ করেছে রুশ বিপ্লব, চীনের গণ-আন্দোলন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলী এবং অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে। ফরওয়ার্ড অত্যন্ত সরাসরিভাবে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সমালোচনায় নেমেছিল, বিরোধিতাও করছিল, যদিও স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের প্রবক্তা ছিল, দৃষ্টান্ত তুলে ধরছিল রুশ বিপ্লবের, যা এইদেশের পক্ষে জরুরি। কিন্তু মার্ক্সীয় সাম্যবাদের কথা বলছিল না। যেমন ১৯২৮ সালের ১৫ মার্চ তারিখে প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসমিতির প্লেনামের ওপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। তাতে আন্তর্জাতিকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সবই বলা হয়েছিল, কিন্তু কোনো মন্তব্য ছিল না। ওই দিনই ১৩ মার্চের কিশোরগঞ্জের সভায় সুভাষচন্দ্রের ভাষণের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সুভাষচন্দ্র সেখানে বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলন কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রথম পর্যায়ে ছিল বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বোমা পিস্তলের আন্দোলন। তৃতীয় পর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলন, অর্থাৎ যা চলছে। অতঃপর আসছে চতুর্থ পর্যায়, যা হবে সশস্ত্র পদ্ধতিতে বিপ্লববাদী আন্দোলন। ১৯২৮ সালের ৬ এপ্রিল নাদেঝদা ক্রুপস্কায়ার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় ফরওয়ার্ড পত্রিকায়: Soviet Russian Campaign against illiteracy—New Russian Culture. বৃটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্তের The Labour Monthly পত্রিকায় ক্লিমেন্স দত্ত একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন এই সময়ে: India's struggle for independence. ফরওয়ার্ড পত্রিকা ১৫ এপ্রিলের সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি পুরোপুরি প্রকাশ করে। প্রবন্ধটির শেষ পর্বে লেখা হয়েছিল:

The real struggle of the Indian masses is already coming into the forefront and will become more and more prominent. since the existing British imperialist exploitation is the greatest oppressor of the Indian masses, the struggle of the latter must be waged under the slogan of complete national independence. Solidarity of the British and Indian workers movements demands, therefore, first of all support of the Indian struggle for independence. The support must be given to the Workers and Peasants Party as the political leader of the revolutionary mass struggle. Only by full support of the anti-imperialist struggle in India will it be possible to prevent British Imperialism using India as a weapon against the workers in this country. Unity in the fight against imperialism is the forefront need of the hour.

সন্দেহ নেই, এই অভিমতের সঙ্গে নিজস্ব ভাবনার মিল ছিল বলেই ফরওয়ার্ড প্রবন্ধটি প্রকাশ করে। তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, লেনিন যাকে বলেছেন শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা, যে-আন্তর্জাতিকতা গড়ে তোলার প্রয়াস নতুনতর প্রেরণা পায় মহাবিপ্লবের আগুন থেকে, সেই আন্তর্জাতিকতার কথা ফরওয়ার্ড পত্রিকায় বারবার উল্লিখিত হয়েছে। তুরস্কে শ্রমিক আন্দোলন, আবিসিনিয়ায় শ্রমিক প্রতিরোধ, জাপানের শ্রমিকদের মধ্যে সাম্যবাদের প্রসার, এসব খবরই প্রকাশিত হয়েছে ফরওয়ার্ড পত্রিকায়। উপরন্তু দেখা যাচ্ছে ১৯২৮ সালের ১৮ এপ্রিলের সংখ্যায় ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে দুটি প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধটি বিশিষ্ট ফরাসী বিপ্লবী আঁরি বারবুসের লেখা : Heroine of the Paris Commune : Story of Louise Michel—The Red Virgin. দ্বিতীয় প্রবন্ধটি : Dictatorship of Proletariat : How Paris Commune worked. লেখকের নাম নেই। কিন্তু লেখাটিতে মার্ক্স, এঙ্গেলস এবং লেনিনের প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে ইতিহাস এবং ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সময়ে চীনের গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে বৃটেন যখন সেখানে আরও সেনা পাঠাচ্ছে তখন, ২১ এপ্রিল তারিখে ফরওয়ার্ড ছাপল দুটি প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধটি আনা

লুই স্ট্রং-এর লেখা Awakened Peasantry of China, এটি উদ্ধৃত হয়েছিল Chineese Students' Monthly পত্রিকা থেকে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির লেখকের নাম নেই। শিরোনাম, Revolution and Peasantry : The Technique, The Trouble, The Programme.

এইভাবে ফরওয়ার্ড পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাবে সেখানে কখনও প্রকাশিত হচ্ছে এ সি এন নাম্বিয়ারের লেখা The Economic Organisation of Soviet Russia, ক্লিমেন্স দত্তের The Poverty of India, এইচ এ নাসিমের Education under the Soviets : New Russia in making, আবার কখনও মহাবিপ্লবের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নাম্বিয়ারের 10 years of Soviet Rule—Steady Progress, শওকত উসমানির War Preparations against Russia, কার্ল মার্ক্সের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে টি এ জ্যাকসনের প্রবন্ধ Karl Marx's feat of vision —Men who saw new order in Despired Mob.

ভাবতে অবাক লাগে, এতটা এগিয়ে এসে ফরওয়ার্ড কিন্তু কোনো জায়গায় অর্থগতভাবেই জাতীয়তাবাদের ঊর্ধে উঠতে পারেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জনজীবনকে সমর্থন করলেও ফরওয়ার্ডের কাছে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ প্রতিভাত হয়েছে জাতীয়তাবাদের পক্ষে মস্তো বিপদ হিসেবেই, এমন কি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষেও (Another potential danger against the Indian freedom movement lies in International Communism. সম্পাদকীয়, ১৪ জুলাই ১৯২৮)। ফরওয়ার্ডের কখনও কখনও মনে হয়েছে, আন্তর্জাতিকতাবাদ গড়ে ওঠে জাতীয়তাবাদকে বিসর্জন দিয়েই। কখনও কখনও বললাম এই কারণে যে, আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষেও যে ফরওয়ার্ড একাধিকবার বক্তব্য রেখেছে সেকথা আগেই বলা হয়েছে। বোঝা যায় এই স্ব-বিরোধিতার মূল কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে এক অদ্ভুত ভ্রান্তি, এক ধরণের দোদুল্যমানতা। কমিউনিজমকে সরাসরি সমর্থনে দ্বিধা আছে ফরওয়ার্ডের, অথচ ১৯২৮ সালের ১৬ আগস্ট তারিখের কাগজে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে লেখা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটি চিঠি ফলাও করে প্রকাশ করা হয় যার শিরোনাম ছিল How to organise Communist Party in India, এবং এই ঘটনাও দেখা গেছে যে ওই বছরের

৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কমিউনিস্টদের দমন করার জন্য জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে বলশেভিক বিল নামে যে আইনের প্রস্তাব আনা হয় (উদ্দেশ্য কমিউনিস্টদের ভারতবর্ষের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া) তার বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে প্রথম প্রতিবাদ জানায় ফরওয়ার্ড' পত্রিকাই (৮ এবং ১২ সেপ্টেম্বর)।

এবং এক্ষেত্রে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সীমিত ক্ষমতা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তার ফলহীনতার কারণে যে আপোষহীন এবং বামপন্থার সূচনা হয় তা ওই সময়ে প্রথাবাদ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে না পারলেও নানাভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছিল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন এই গোষ্ঠী ৩৮ সালের ১ অক্টোবর এক বৈঠকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অব ইণ্ডিয়া লীগ গঠন করে। ওই বৈঠকে একটি ইস্তাহার ও কর্মসূচীও গৃহীত হয়। সেই ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়, স্বাধীনতা মানে অবশ্যই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। গৃহীত কর্মসূচীর অর্থনৈতিক গণতন্ত্র শিরোনামে মূলনীতি সম্পর্কে বলা হয়ঃ Removal of Economic Equalities, Equitable redistribution of wealth, Provision of equal oppurtunities for all, Raising the standard of living. লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানে রয়েছে মহাবিপ্লবকালে লেনিনের সেই কথারই প্রতিধ্বনি, সেই কথা, যা পরে সোভিয়েত সংবিধানের মূল প্রতিশ্রুতি হয়ে ওঠে।

আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ২৭ সালের নভেম্বরে ইয়ং ইণ্ডিয়ার একটি সংখ্যায় গান্ধীজী 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ সম্পর্কে বলশেভিক আদর্শের' সমালোচনা করে বলেনঃ This is only an application of ethical ideal of non-possession in the realm of economics and if the people adopted the ideal of their own accord or could be made to accept it by means of peaceful persuasion there would be nothing like it. But from what I know of Boishevism it not only does not preclude the use of force but truely sanctions it for the expropriation of private property and maintaining the collective state ownership of the same. And if that is so, I have no hesitation in saying that the Bolshevik regime in its present form cannot

last for long, for it is my firm conviction that nothing enduring can be built on violence.

উত্তরে ১৮ নভেম্বর তারিখে ফরওয়ার্ড লিখলো : It is difficult to believe, however that the owners of big fortunes, taken as a class, will ever be persuaded to part with their wealth peacefully. If the Bolsheviks use violence, that is a failing which they share for other Govts, for all Govts. are ultimately based on violence. And yet, in spite of Mahatmajis firm conviction, these Govts. have managed to live for centuries.

আর তার কয়েকদিন পরেই বৃটিশ প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলম জুড়ে খবর ছাপা হলো : Repression Runs Amuck. তার নীচে, Searches and Arrests All over India, Hunt for Bolshevik Literature. এবং তারপরে আলাদা তিন কলমের হেডিং-এ খবর, Police Raids All over the city, Calcutta Sensation.[66]

ফরওয়ার্ড ছিল ইংরেজি দৈনিক। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্রের আলোচনায় হিন্দু প্যাট্রিয়টের অনুপ্রবেশের যে অধিকার, ফরওয়ার্ডের তেমনই। কারণ মূলতঃ দুটি। প্রথমত, ফরওয়ার্ড ইংরেজি দৈনিক হলেও বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ধারার রাজনৈতিক আন্দোলন সেখানে আলাদা জায়গা পেতো। ফরওয়ার্ড ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের বৃটিশ স্তাবকতার যেমন বিরোধিতা করতো, তেমনই একই সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামী মানুষের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, সেই সময়ে রুশ বিপ্লবের ইতিহাস, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ও তার অগ্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে একটানা প্রচার সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোনো পত্রিকা করেনি। এমনকি এদেশে বোম্বাইয়ে সূতাকলগুলিতে ধর্মঘট, দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ধর্মঘট, টাটা ইস্পাত কারখানায় ধর্মঘট—শ্রমিক আন্দোলনের এই সমস্ত ঘটনাই তুলে ধরতো ফরওয়ার্ড এবং তা সমর্থন করতো সর্বোতভাবে।

তিরিশের দশক পর্যন্ত এইভাবেই চলেছে। রুশ মহাবিপ্লবের ঢেউ স্পর্শ করেছে এদেশের মুক্তি আন্দোলনকে, প্রভাবিত করেছে বুদ্ধিজীবীদের, উদ্দীপিত করেছে সাধারণ মানুষকে সাম্যবাদের আদর্শে ব্রতী হয়ে সংগঠন গড়ে তোলায় এবং নতুনভাবে আলোকিত করেছে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে।

ভারতবর্ষে সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নভেম্বর বিপ্লবের অবদান যতটা, ঠিক ততটাই এদেশের, বিশেষত বাংলা সংবাদপত্রের চরিত্র-গঠনে। যে চরিত্র হলো কমিটমেন্টের, দায়বদ্ধতার। হিন্দু প্যাট্রিয়ট থেকে শুরু করে সন্ধ্যা যুগান্তর পত্রিকা পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্রের যে চরিত্র ছিল তা নিশ্চয়ই দায়হীনতার নয়। কিন্তু এর পেছনে কোনো একজন বা কয়েকজন বা নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর উদ্যোগ এবং চেতনা কাজ করেছে। সঠিকভাবে বৃহত্তর আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর সাংগঠনিক উদ্যোগে সংবাদপত্রের আবির্ভাব—এর পেছনে রুশ বিপ্লবের অবদান ছিল অনেকটাই। ইদানীংকালে সংবাদপত্রের ব্যবসা (Business of Newspaper) স্ফীতকায় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে-শ্রেণীচেতনা থেকে স্বাধীনতাপূর্ব কালে হাজার হাজার কাগজ বেরিয়েছে শুধুমাত্রই অবয়বহীন দেশপ্রেমের আবরণে এবং দোদুল্যমান রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে, সেই শ্রেণীচেতনা থেকেই এই ব্যবসায়তনিকার বিকাশ। এরা শুধু চেহারার পরিবর্তন করেছে মাত্র, চরিত্রের নয়। কিন্তু সংবাদপত্রের দায়বদ্ধতার (Commitment of Newspaper) যে বীজ প্রোথিত হয়েছিল বিশের দশকে, আজও তার কোনো হেরফের হয়নি। বরং সাধারণ সংবাদপত্রের তুলনায় নির্দিষ্ট আদর্শ-ভিত্তিক (স্বাধীনতা-উত্তরকালে যা বামপন্থী হিসাবে চিহ্নিত) সংবাদপত্রের সংখ্যা আজ কয়েকশ' গুণ বেশি। এবং আজকের এই পরিস্থিতির ভিত্তি রচনা করেছিল তিরিশ এবং চল্লিশের দশক, যার জন্ম বিশের দশকের গর্ভে। রুশ মহাবিপ্লবের ঢেউ বিশের দশকের বাংলা সংবাদপত্রকে উন্নীত করলো এক বিশাল এবং ব্যাপ্ত রণক্ষেত্রে, সে-রণক্ষেত্র বিপ্লববাদী আদর্শের।

সংযোজন

তিরিশ ও চল্লিশের দশকে যাবার আগে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখে রুশ মহাবিপ্লবের নেতা লেনিন প্রয়াত হন। এদেশে এখবর মূলত পৌঁছে দেয় সংবাদসংস্থা রয়টার। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত এবং ইংরেজ শাসনের মুখপত্র কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা গুরুত্বজনকভাবে খবরটি প্রচার করে। খবরটির শিরোনাম দেওয়া হয়: Death of 'Red' President. Lenin's notorious career. খবরটি ছিল

এইরকম ঃ The death is annnunced of M. V. I. Ulianov Lenin, President of the Russian Soviet Republic.

Lenin, collaborating with Leo Trotsky, was primariiy responsible for the Bolshevik Coup-d-etat in November, 1917 and the consequent formation of the Russian Republic. Before that time he had long been known as extreme revolutionary and prior to the Bolshevik upheaval had lived in Switzerland since he dared not enter his own country in the days of the war. When the Bolsheviks obtained power in Petrograd Lenin became Prime Minister, and it was believed that he and Trotsky hoped at first to control the whole of Russia. As Soviet dictator in early days of Red in Russia he achieved much notoriety in connection with the crimes attributed to the Bolshevik require He was ex'remely popular in Russia during his term of office and stood immeasurably above his confederates as far as ability was concerned.

Possessed of a remarkable degree of cunning his was the mind that inspired the policy of communists and kept the peace within their ranks. For five years Lenin was the dominating feagure in the Bolshevik Government.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সংবাদপত্রের জগতে যে অপ-সাংবাদিকতার আবির্ভাব ঘটে তার পেছনে বৃটিশ সংবাদনিষ্ঠার অবদান যে কতখানি এই রিপোর্ট থেকেই তা বোঝা যাবে। লেনিন চিত্রিত হয়েছেন ধূর্ত এবং বদমাশ হিসেবে। রুশ বিপ্লবকে বলা হলো নিছকই অভ্যুত্থান। এবং মহাবিপ্লবে জন-জাগরণে তাদের অংশগ্রহণ করানোয় বলশেভিকরা যা করেছে তা মহা-অপরাধ! কিন্তু ইংরেজ-পোষ্য স্টেটসম্যান এবং তার সঙ্গীদের এই প্রচার যে খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে তা বোঝা যায় বাংলাদেশ, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিক্রিয়ায়। গোটা দেশ সেদিন শ্রদ্ধা জানিয়েছিল লেনিনকে।

১৯২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় লেখে : The death of Lenin, which we believe has at last really taken place, removes one of the most outstanding personalities of modern times. Probably no one has been more greatly misrepresented and misunderstood by his contemporaries than this dominating figure of colossal influence in Soviet Russia. After what all has been said and done, when the dust of controversy and the shock of surprise will disappear, and the history of modern world will be impartially written, Lenin will come to be regarded as one of those men who, in spite of his short comings, made a most remarkable attempt to reconstruct society on the basis of communism. The experiment was novel but it was calculated, as pointed out by a prominent Bolshevist the other day, to destroy the whole fabric of society based on Capitalistic system, vested interests of the world were, therefore, naturally alarmed by this experiment and the whole capitalistic Europe rose against him. But be it said to the credit of this wonderful man, that nothing could daunt him and that by a combination of astounding power of organisation and resourcefulness he made the Red Army, the revolutionary messenger of the new cult of socialism, a formidable power in Europe. It will serve no useful purpose today to discuss how far his ideal was practicable and how far in the pursuit of this ideal he had to adopt means which was the negation of all human freedom. But suffice it to say that the seeds of revolution which he had left broadcast over the world today shall never be easily destroyed. May the soul of this extraordinary personality rest in peace.

২৬ জানুয়ারি তারিখে বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন : The death of Lenin has removed this world one of the most

striking and masterful Personalities of modern time. a man who had a large hand in shaping a new heaven and a new earth in our days. After the crash of the Czarist regime in 1917 Lenin saw the oppurtunity of installing in his own country his favourite system of Government. The middle class regime of Kerensky was already tottering. And six months after the fall of Czardom, when Lenin and his party were allowed through Germany, to return to Russia, the Kerensky Government fell and the administration passed into the hands of Lenin. Since then, for the last six years, he had ruled Russia with an iron hand, and created though after much blood shed, a sart of an organised Government out of a varitable chaos that had become the order of the day,after the fall of Czar Nicholas. Exception has truly been taken to the principles of Government established and to the economic heresy preached and practised by this Great Bolshevik leader but admiration and appreciation are due to the memory of the man to whose organising capacity and administrative ability Russia owes her present position among the modern democratics of the world.

১৯২৪ সালের ২ এপ্রিল আত্মশক্তি পত্রিকায় লেনিন নামে এক নিবন্ধে হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখছেন : মিত্রশক্তি বরাবর বলশেভিজম এবং ইহার নেতার কলঙ্ক রটনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। লোকের চক্ষে লেনিনকে রক্তপিপাসু নররাক্ষস বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টাও বড় কম হয় নাই। ইহারা লোককে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে লেনিন মানব-শত্রু এবং মিত্রশক্তিই একমাত্র মানব মিত্র। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এই মহামানবের অনিষ্ট মিত্রশক্তি করিতে পারে নাই। লেনিনের চরিত্রগুণে এবং প্রতিভা-শিখায় সকল কলঙ্ক কথা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে। লেনিন ছিলেন গরীবদের মানুষ, তাহাদের দুঃখ তিনি নিজের দুঃখের মতো অনুভব করিতেন ; একজন মানুষ দুঃখী থাকিবে এবং আর একজন সেই সময় সুখী হইবে, মহাপ্রাণ

লেনিন ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। পৃথিবীর দুঃখের এবং সুখের বোঝার ভার সকল মানুষকে সমানভাবে বহন করতে হইবে এই ছিল লেনিনের মত···সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের স্রষ্টা, ভাবুক দার্শনিক ও কর্মযোগী লেনিনের দেহাবসান ঘটিয়াছে। ···দেশের স্বার্থই লেনিনের স্বার্থ ছিল—তাঁহার স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ ছিল না। কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান কাগজ লেনিনের সম্বন্ধে কিছু না কিছু কুৎসা রটনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাহাদের কাজই ছিল কিসে বলশেভিজমকে পৃথিবীর কাছে হেয় করা যায়—কিন্তু এত করিয়াও তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

এছাড়াও অজস্র পত্রপত্রিকা লেনিনকে শ্রদ্ধা জানায়। বম্বে ক্রনিকল সম্পাদকীয়তে লেখে : One of the three greatest living men of the world. ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় : Piloted his country with no small success through a revolution of unprecedented magnitude. ফরওয়ার্ড পত্রিকা লেখে : Lenin is alive in the hearts of workers. আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে, বিশ্বের এক বিরাট ক্ষতি। দৈনিক বসুমতী বলে, লেনিন হলেন এক মহান কীর্তিমান মানুষ। নায়ক মন্তব্য করে, বর্তমান বিশ্বে তাঁর মতো বিদগ্ধ ও প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিক আর কেই-বা আছে। অন্যান্য যেসব কাগজ লেনিনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এবং শ্রদ্ধা জানায় তার মধ্যে আছে হিন্দুস্তান, সুলতান, সচিত্র শিশির, বঙ্গবাণী, জ্যোতি, দেশভক্ত, উৎস, বর্তমান, আজ, মেদিনী, মজদুর, স্বদেশমিত্রন, অন্ধ্র পত্রিকা, তামিলনাড়ু, কেশরী প্রভৃতি।[৫৬]

উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন ছিল দুটি। প্রথমটি হলো এস এ ডাঙ্গের সোস্যালিস্ট পত্রিকা, যা এদেশে ইংরেজি ভাষায় এদেশের কমিউনিস্টদের প্রথম পত্রিকা হিসেবে পরিচিত। এই পত্রিকায় বলা হয় : The world of downtrodden and oppressed wanted him to live, to live for a hundred years, if that could be done, the world of oppressors wanted him to die, the next minute that he was Lenin. He left writing a book on revolution to work out a revolution. And he did it successfully.[৫৭]

দ্বিতীয়টি হলো, মাদ্রাজের হিন্দুস্তান লেবার কিষান পার্টির পত্রিকা লেবার কিষান গেজেটে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহকে লেনিন শোক সপ্তাহ

হিসাবে পালন করার আহ্বান জানালেন ওই পার্টির নেতা এবং এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সিঙ্গারভেলু চেট্টিয়ার। একটি শোকলিপিও তারা প্রকাশ করেন।[৫৮]

বাংলাদেশে লাঙল-গণবাণী, মাদ্রাজে লেবার কিষান গেজেট, বম্বেতে সোস্যালিস্ট—সব একই ধারায় চলছিল, একই প্রবাহে, একই পদশব্দে একই রণক্ষেত্রের দিকে।

৪

আদর্শের রণক্ষেত্রে

১৯১৮-২৯ সাল থেকেই সাম্যবাদী আদর্শে উদ্দীপিত সংগঠন বাংলাদেশে দ্রুত ছড়াতে থাকে। একদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান, অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ পথ বেছে নেওয়া হবে, অবশ্যই সেটা ছিল সাধারণ মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু রুশ বিপ্লব এদেশের বিপ্লববাদীদের সব থেকে বড়ো যে-শিক্ষা দিয়েছিল তা হলো সংগঠন গড়ে তোলার গুরুত্ব, যে-সংগঠনের শরিক হবে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত মানুষ। কার্যত এই বোধ থেকেই সর্বস্তরে সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ দেখা দেয়, শ্রমিক-কৃষক থেকে শুরু করে ছাত্র-যুব পর্যন্ত। ৩২-৩৩ সালের মধ্যেই দেখা গেল এই ধরণের সংগঠন যথেষ্ট মজবুত হয়ে উঠেছে, এমন কি নিয়মিতভাবে কোনো না কোনো মুখপত্রও প্রকাশিত হচ্ছে। পুরনো নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৯২৮ সাল নাগাদ দেশের ডাক ও তার কর্মীরা সর্বভারতীয় স্তরে যে-সংগঠন গড়েছিলেন

'ডাকশক্তি' নামে তার পক্ষ থেকে পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়। সেই পত্রিকায় তাঁদের আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের ভূমিকা কী, এনিয়ে নানা আলোচনা থাকতো। সরোজ মুখার্জি জানাচ্ছেন, এই সময়ে স্তালিনের লেখা লেনিনিজম, জন রীডের টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড, প্রভৃতি বই এদেশে এসে পৌঁছেছিল এবং তা বিপ্লববাদীদের হাতে হাতে ঘুরতো। এমন কি বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাও তা পড়তেন। সরোজ মুখার্জি আরও জানাচ্ছেন, '৩০ সাল নাগাদ, সোমনাথ লাহিড়ী ও আরও কয়েকজন, তখন তাঁরা ছাত্র, অভিযান-নামে একটি পত্রিকা করতেন। সরোজ মুখার্জি, প্রমথ ব্যানার্জি প্রমুখ বর্ধমান থেকে সাইক্লো-করা একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন সাম্য নামে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা তাতে থাকতো। চন্দননগর থেকে ৩১ সালে লাল নিশান নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় মণিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। ওই সময়েই দেবাংশু দাশগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ছাত্রদল। অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছিল ছাত্র পত্রিকা। ১৯৩১ সালে হিজলী জেলে পুলিসের গুলিতে নিহত সন্তোষ মিত্র ওই একই সময়ে বের করছিলেন নিউ লাইট নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক। এবং এই ১৯৩১ সালেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা হিসেবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটি গঠিত হয়।[৫৯] আর এই সময় থেকেই বাংলা সংবাদপত্রের পূর্বতন জন্মান্তর ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে লাগলো স্বতন্ত্র রূপ, রুচি ও রাস্তা। অসংখ্য ধারায়, অসংখ্য প্রকাশে।

১৯৩১ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় চাষীমজুর সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৯৩১ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় দিনমজুর সাপ্তাহিক পত্রিকা, স্বদেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায়।

১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয় মার্ক্সবাদী নামে একটি মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক অবনী চৌধুরী। ১৯৩৩-এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

এবং এরই মধ্যে ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় মার্ক্সপন্থী নামে আর একটি পত্রিকা।

১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় নয়া মজদুর নামে একটি বাংলা পত্রিকা।

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় গণশক্তি সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক সরোজ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৮ সালের আগস্ট থেকে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত নব পর্যায়ে গণশক্তি মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়।[৬০]

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য কিছু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩২ সালে তখন বম্বে ক্রনিকল পত্রিকার কলকাতার চিফ করেসপণ্ডেন্ট মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল কলকাতা থেকে দি কমরেড নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ৩২-৩৩ সালে কয়েকটি শ্রমিক আন্দোলনকারী গ্রুপ কাজ শুরু করে। প্রত্যেক গ্রুপেরই ছিল একটি করে সংবাদপত্র। যেমন লেবার পার্টির কাগজ ছিল নিউ ফ্রন্ট, পরে লেবার ফ্রন্ট। কারখানা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কারখানা গ্রুপ। সর্বহারা পত্রিকাকে কেন্দ্র করেও একটি শ্রমিক গ্রুপ তৈরি হয়েছিল। যেমন একটি গ্রুপ তৈরি হয়েছিল লাল নিশান পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। স্ফুলিঙ্গ নামেও একটি পত্রিকা এঁরা প্রকাশ করেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি নামে পৃথক একটি দল পরে তৈরি হয় এবং তাঁরা প্রকাশ করেন প্রথমে গণবাণী এবং পরে জনসাধারণ নামে পত্রিকা। এই সময়ে দি কমিউনিস্ট নামে একটি সাইক্লো-করা পত্রিকা প্রকাশিত হতো, কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটির মুখপত্র হিসাবে। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যায় প্রথম পাতায় লেখা হয়: The Communists will lead the workers and the peasantry and the revolutionary intelligentsia to overthrow the capitalist system on the basis of Marxist-Leninist strategy and tactics for finally building up socialism under the revolutionary leadership of Communist International. As the advance guard of all the the exploited and oppressed in India, it can look for help only to the oppressed and exploited and to those who have made common cause with them. We hope they will come forward with their help.[৬১]

১৯৩৭ সালের জুন মাসে দি কমিউনিস্ট পত্রিকায় লেখা হলো: জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন থেকে ফৈজপুর অধিবেশন পর্যন্ত সময়ে দেশের বামপন্থী শক্তিগুলির আরও শক্তিশালী হওয়ার চরম অনুকূল

পরিস্থিতি বর্তমান। জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে তখন রয়েছেন জওহরলাল নেহরু। তাঁর কংগ্রেস সভাপতির সরকারী আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া ছাড়াও গান্ধীজীর পরেই তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী জাতীয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সময় তিনি বামপন্থীদের পক্ষে তাঁর প্রভাব সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। এতে বামপন্থী শক্তিগুলি প্রচণ্ড উৎসাহ পেল। এতে কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের একটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চে রূপান্তরিত করার সুযোগ সৃষ্টি হলো। জনগণের মধ্যে যে ব্যাপক সংগ্রামশীল প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছিল তাকে সংগঠনগতভাবে সুসংহত করার দায়িত্ব বামপন্থীদের গ্রহণ করতে হবে। জওহরলাল নেহরুকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করার কাজ কিন্তু বামপন্থী সংগঠনগুলিকে (কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি প্রভৃতি) ব্যাপকভাবে গড়ে তোলার বিকল্প নয়। বামপন্থীদের সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও কৃষক সংগঠনগুলিকে অতিশয় শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থেকে বিরাট শক্তিশালী সংগঠনে রূপান্তরিত করা। কমিউনিস্ট পার্টিকে ট্রেড ইউনিয়ন, জাতীয় কংগ্রেস, কৃষক ও সাংস্কৃতিক---সমস্ত ফ্রন্টে কার্যকরী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সংগঠিত করতে হবে।[৬২]

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। এই সময়ে দেখা যাবে কোনো পত্রিকাই একটানা বেশিদিন চলতে পারেনি। একই উদ্যোগে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর অন্যতম কারণ ছিল পুলিসের আক্রমণ এবং সংবাদপত্রের জামানত বাজেয়াপ্ত করা। কোনো পত্রিকার ওপর আঘাত এলে সেটিকে না চালিয়ে নতুন পত্রিকা প্রকাশ করা সুবিধাজনক ছিল। কমিউনিস্ট পার্টিও সেই সময়ে গোপনে কাজকর্ম করতো। দি কমিউনিস্ট পত্রিকাও গোপনেই প্রচার করা হতো। '১৯৩৭ সালের শেষদিকে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর কলকাতা থেকে বোম্বাই শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অনুকূল পরিস্থিতির দরুন কেন্দ্রীয় কমিটি একটি প্রকাশ্য ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত করে। পত্রিকার নাম দেওয়া হয় ন্যাশনাল ফ্রন্ট। এস ভি ঘাটের সম্পাদনায় নিউ এজ নামে একটি ত্রৈমাসিক, পরে মাসিক, ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। তখন এ পত্রিকা তিন—চার সংখ্যার বেশি বের হয়নি। ন্যাশনাল ফ্রন্টের

সম্পাদক হন পি সি যোশী। সম্পাদকীয় বোর্ডে ছিলেন পি সি যোশী, বি টি রণদিভে, এস এ ডাঙ্গে, অজয়কুমার ঘোষ, ও এস মহম্মদ্‌জাফর। পুরো ১৯৩৮ সাল এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালের কয়েক মাসও এই কাগজ চলে। ...১৯৩৭ সালে গণশক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে মাসিকপত্র হিসাবে প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকেন মুজফফর আহমদ, সোমনাথ লাহিড়ী, বঙ্কিম মুখার্জি, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, দেবকুমার দাস ও মনোরঞ্জন রায়। .... ছয় সংখ্যা এই মাসিকপত্র চলে।'

উল্লেখ্য, এর আগে এবং এই সময়ে গণশক্তি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা গণশক্তি পাবলিশিং হাউস স্থাপন করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাম্যবাদী উর্দু দৈনিক রোজানা হিন্দকে কেন্দ্র করে রোজানা হিন্দ পাবলিশিং হাউসও স্থাপন করা হয়। কমিউনিস্ট নেতাদের ব্যাপক হারে গ্রেপ্তারের সময় যখন গণশক্তি পত্রিকা এবং তার পাবলিশি' হাউস বন্ধ হয়ে যায় তখন বাংলায় মার্ক্সবাদী বইপত্র প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিল রোজানা হিন্দ পাবলিশিং হাউস।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের মার্ক্সপন্থী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যাচ্ছে, ওই সময়ে গণশক্তি পাবলিশিং হাউস যেসব বইপত্র প্রকাশ করে তার মধ্যে আছে: আবদুল হালিমের লেখা রাশিয়ার গণ-আন্দোলন, কমিউনিস্ট ইস্তাহার, বলশেভিক পার্টির ইতিহাস, চীনের কম্যুনিষ্ট বিপ্লব, সোমনাথ লাহিড়ীর রাষ্ট্র ও আবর্তন, লেনিনবাদের বনিয়াদ, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেনিন, রোজা লুক্সেমবুর্গ, ফ্যাসিজম; স্বদেশরঞ্জন দাশের, রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি সর্বহারার দৃষ্টিতে, লেনিনবাদের সমস্যা; সরোজ মুখার্জীর প্যারী কমিউন, ১৯০৫ সালের বিপ্লব, সাম্যবাদে ভারত, ধীরেন সেনের কার্ল মার্ক্স ও তাঁহার মতবাদ।

১৯৩৪ সালে গণশক্তির প্রথম পর্যায়ের শেষ সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয়: মজুর ও চাষীদের কাগজ—১। মজদুর কা ডঙ্কা (হিন্দী), ২। নয়া মজদুর (নব পর্যায়, হিন্দী ও বাংলা), ৩। দিন মজুর (বাংলা), ৪। সাপ্তাহিক গণশক্তি।

সোমনাথ লাহিড়ী এই সময়কালের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন: চাষী মজুরের চরিত্র ছিল কিছুটা শ্রমিক কৃষক সংগঠনের গেজেটের মতো। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কৃষক-মজুর সংবাদ প্রকাশ করা

এবং তার সাহায্যে শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে প্রাথমিক সংগঠন শুরু করাই ছিল উদ্দেশ্য। পরবর্তী পর্যায়ে বের করা হয় মার্ক্সবাদী, মার্ক্সপন্থী নামে কয়েকটি কাগজ। তখন দেশের মধ্যে ছোট বড়ো কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন গোষ্ঠী বা গ্রুপ তৈরী হয়েছে। এই কাগজগুলোর প্রধান লক্ষ্য ছিল এই সব বিচ্ছিন্ন গ্রুপের মত ও পথের বিভ্রান্তি কাটানো। স্বতঃস্ফূর্ততা, অর্থনীতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের প্রভাব মুক্ত করে, কমিউনিস্ট মতবাদকে প্রকাশ করা। কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন কর্মীদের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে সংহতি সৃষ্টি করাই ছিল এই স্তরের কাগজগুলোর প্রধান কাজ। এই কাজ করতে করতে আমরা দেখলাম কিছু কমিউনিস্ট কর্মী তৈরী হয়েছে। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের মধ্যে আমরা খানিকটা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছি। আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তৈরী কমরেডরা প্রত্যক্ষ গণ-আন্দোলনে নেমে পড়ছেন। আন্দোলন ও সংগঠনে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছেন। এই সময়ের কাগজ গণশক্তি। গণশক্তির পর্যায়ে আমরা জাতীয় স্তরে কাজ শুরু করেছি। ১৯২৯-এর গোড়ায় গণশক্তি সরকার বন্ধ করে দেয়। আমিও জেলে চলে যাই। জেল থেকে বেরিয়ে কাগজ শুরু করি আগে চলো। আগে চলো-র চরিত্র গণশক্তির থেকে আলাদা হলো। তখন শ্রমিক কৃষক আন্দোলনে আমাদের প্রভাব বেড়েছে। প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়েছে। শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ছাড়াও জাতীয় রাজনীতির নানা বিষয়—তখনকার আইনসভার কাজকর্ম, মন্ত্রিসভার সমালোচনা এবং অন্যান্য বিষয় যা সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করেছিল এমন সব কিছু আগে চলো-র পাতায় স্থান পেতে লাগলো। আগে চলো হলো গণমুখী সাপ্তাহিক। বৃহত্তর পরিধির আন্দোলনের কাগজ। আগে চলো বেআইনী হলো। আমরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হলাম। এই সময়ে আমরা বেআইনী ছাপাখানা তৈরী করে বলশেভিক নাম দিয়ে বেআইনী কাগজ শুরু করি.... বেআইনী কাগজ রাখার ঝুঁকি যথেষ্ট। তা সত্বেও বলশেভিক-এর প্রচার বাড়তে লাগলো। বলশেভিক-এর জনপ্রিয়তা ছিল বিশেষত যুব সমাজের মধ্যে। স্কুল কলেজে বলশেভিক দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। ১৯৪০, তাই এই কাগজের মূল উপজীব্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন।... বলশেভিক জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ, যুদ্ধের অত্যাচার ও যুদ্ধবিরোধী লড়াইয়ের খবর বলশেভিকই নির্ভীকভাবে ছাপতো।

জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোর ওপর ছিল একদিকে সরকারী চাপ অন্যদিকে বিভ্রান্তি। ৬৩

সোমনাথ লাহিড়ীর এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপট পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলির পাতায়। গণশক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লেখা হচ্ছে: বারবার তাই বলতে হচ্ছে যে বিপ্লবীদের সামনে আজ এইটাই সব থেকে বড়ো কথা। প্রত্যেক বিপ্লবীকে আজ দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করতে হবে যে—সংগঠনের পথে আমরা এক পা এগিয়েছি, দু পা টেনে পিছিয়ে আনতে আমরা কিছুতেই দেব না। সংগঠনের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আদর্শমূলক দ্বন্দ্ব চলুক, কারণ 'পার্টির মধ্যেকার সংগ্রাম পার্টিকে জীবন ও শক্তি এনে দেয়। ...কোনো পার্টির দুর্ব্বলতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল তার বিচ্ছিন্নতা ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখার অস্পষ্টতা...' (মার্ক্সকে লেখা লাসালের এক চিঠি থেকে লেনিনের কোটেশন)। কিন্তু আদর্শের নামে যারা সংগঠনের অগ্রগমনকে বাধা দেবে আর সেই বাধার ভয়ে যারা সংগঠনের কেন্দ্রীকরণের দায়িত্ব নিতে সাহস করবে না, তাদের কারুর বাধাই আমরা মানব না। লেনিনের কথাকেই একটু ঘুরিয়ে আমরা বলব—শক্তিলাভের সংগ্রামে প্রলেটারিয়েটের হাতে সংগঠনের অস্ত্র ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। ধনবাদী দাসত্বের শৃঙ্খল, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও আক্রমণের বর্দ্ধমান চাপ সর্ব্বহারাকে নীচে থেকে আরও নীচে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে। তাদের আক্রমণকে পঙ্গু করে প্রলেটারিয়েট বিশ্বজয়ী শক্তিতে পরিণত হতে পারে শুধু তখনই যখন মার্ক্সবাদী আদর্শের ঐক্য সংগঠনের বাস্তব ঐক্যের গাঁথুনির মধ্যে দৃঢ়ীভূত হয়।

পাশাপাশি ১৯৩৯ সালের ২৮ মে তারিখের আগে চলো-তে খবর: সারা ভারতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী। দিকে দিকে বিরাট সভা। এবং ২৫ জুনের সংখ্যার প্রধান খবর: সোস্যালিস্ট ঐক্যের পথে ভেদপন্থীদের প্রতিক্রিয়া। কংগ্রেসে সোস্যালিস্ট পার্টির কার্য্যকরী সমিতি হইতে মাসানী প্রভৃতির পদত্যাগ।

সোমনাথ লাহিড়ী লিখছেন: এর পরেই এসে গেলো ৪১ সাল। সোভিয়েত আক্রমণের ফলে আমাদের কাছে যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে গেছে। আমরা জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করেছি। তখনকার কাগজ হলো জনযুদ্ধ। ...জনযুদ্ধের সময় পার্টির লাইন ছিল যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে যতদূর সম্ভব সমর্থন

কর। যেখানেই প্রয়োজন লড়াই কর। জনযুদ্ধের প্রচার ছাড়াও এই কাগজের একটি নতুনত্ব ছিল এক্সপোজারমূলক লেখা। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বেড়ে ওঠা সবরকম দুর্নীতির মুখোশ খুলে দেওয়ার কাজে আমরা নির্ভীকভাবে নতুন পথ দেখিয়েছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের মূল রাজনৈতিক লাইন মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। তবু দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লেখা এবং কাজ সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী পেরিয়ে জনসাধারণের কাছে নিয়ে গেলো। —জনযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই গণ-সাপ্তাহিক হতে পারলো। মূলনীতিতে অবিচল থেকেও জনযুদ্ধের পাতায় সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী শোষকদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কষ্ট ও প্রতিবাদকে ভাষা দিতে পেরেছিলাম। ....জনযুদ্ধের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা দৈনিক 'স্বাধীনতা'-র কথা ভাবতে পেরেছিলাম (১৯৪৫, ডিসেম্বর)। জনযুদ্ধই স্বাধীনতায় রূপান্তরিত হলো। দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধোত্তর বিদ্রোহের মেজাজ ফুটে উঠেছে। ...স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ অর্থেই একটা সার্বজনীন সংবাদপত্র করে তুলতে পেরেছিলাম।[৬৩]

একথা স্বীকৃত, জর্মনীর সোভিয়েত আক্রমণকে এদেশের কমিউনিস্টরা এবং কমিউনিস্ট মতাবলম্বী পত্রপত্রিকাগুলি নিজেদের যুদ্ধ বলে গ্রহণ করে। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করতেই নাৎজী জর্মনীর বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং সোভিয়েতের সঙ্গে যেহেতু বৃটেনের চুক্তি হয় এবং নাৎজী-বিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েত, বৃটেন এবং আমেরিকা একসঙ্গে যুদ্ধ করে, তাই এদেশে কমিউনিস্টরা প্রকারান্তরে সেই সময়ে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে জোর কিছুটা কম দেন। সেই কারণেই সোমনাথ লাহিড়ী বলছেন, আমাদের জনযুদ্ধের নীতি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হতে পারেনি। কংগ্রেস সেই সময় প্রকাশ্যেই বৃটেনের সমর্থনে নামে। গান্ধীজী স্পষ্টই ঘোষণা করেন, বৃটেনের এখন ঘোর দুর্দিন, বৃটেনের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে এই : কংগ্রেস ডাক দেয় বৃটেনকে বাঁচানোর। অন্যদিকে কমিউনিস্টরা জনমত গড়ে তোলেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাঁচানোর পক্ষে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকেই কিন্তু বেরিয়ে এসেছিল 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'।

কিন্তু সোমনাথ লাহিড়ী যে কথাটি উল্লেখ করেছেন, সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ-দুর্দশার কথা বলা, এটাই হয়ে ওঠে জনযুদ্ধের অপ্রতিদ্বন্দ্বী

চরিত্র। বাংলাদেশে ইংরেজ প্রশ্রয়ে দুর্ভিক্ষ দানা বাধতে থাকে। সে ব্যাপারে প্রথম প্রতিবাদ এবং সতর্কতা আসে জনযুদ্ধের কাছ থেকেই। ১৯৪২-এর ১৬ মে তারিখে জনযুদ্ধ লিখছে: আমাদের পত্রিকার এই মুহূর্তের একমাত্র রাজনীতি কি? তা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট দস্যুদের আসন্ন আক্রমণ থেকে আমাদের দেশকে বাঁচানোর জন্য দেশের সমস্ত নরনারীকে ভয়হীনভাবে উদ্দীপিত করা, পৃথিবী ব্যাপী জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সবল হস্তে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করা।

১৯৪২ সালের ১০ জুনের জনযুদ্ধ থেকে জানা যাচ্ছে, সেই সময়ে: দুঃখের হইলেও একথা সত্য যে এদেশের বেশির ভাগ লোক এ যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে আজও উৎসাহিত হয় নাই। তাহা করিতে হইলে তাহাদের খণ্ড খণ্ড দাবীকে মানিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় গভর্নমেন্টের অধিকার দিয়া দেশের বিরাট জাতীয়তাকে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জাতীয়তায় পরিণত করিতে হইবে। অন্যপক্ষে বাধা বা দমননীতি তাহাদিগকে যুদ্ধের বিরোধীই করিয়া তুলিবে। কিন্তু কিছুদিন হইতে মনে হইতেছে সরকার যেন স্থির করিয়া লইয়াছেন যে দমননীতিই যুদ্ধকে আগাইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। এ আই সি সি অফিসে খানাতল্লাশ, ন্যাশনাল হেরাল্ডের জামীন দাবী, ইউ পি-তে কয়েকজন কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তার সম্প্রতি হইয়াছে। ৩১ মে হইতে ৬ জুন এই ৭ দিনের মধ্যে কাগজের মোটামুটি হিসাবে বাংলাদেশেই মোট ২২টি খানাতল্লাশী, ২৬ জন গ্রেপ্তার, ১ জন দণ্ডিত। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচারে ও আন্দোলনে যাহারা অগ্রণী তাহাদের উপরেও গত সপ্তাহে দমন ঘণীভূত হইয়াছে। ছাত্র ফেডারেশনের অফিস সার্চ হইয়াছে, তিনজন ছাত্রকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, ঢাকায় জনযুদ্ধের কর্মী জিতেন ঘোষকে ডেটিনিউ করা হইয়াছে, জনযুদ্ধ পত্রিকার উপর সরকারের সাবধানী পরোয়ানা জারি হইয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিম মুখার্জির সম্পাদনায় জনযুদ্ধ পত্রিকা পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালের ১ এপ্রিল। প্রথম সংখ্যায় হীরেন মুখোপাধ্যায় লেখেন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নামে একটি প্রবন্ধ। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লেখেন সোভিয়েতের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ। এছাড়া লেখা ছিল গোপাল হালদার, সুধী প্রধান এবং বিনয় ঘোষের। ১ মে থেকে জনযুদ্ধ সাপ্তাহিক হয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ

করা দরকার, এদেশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনমানসে যে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, যার পরিণতিতে প্রথমে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (১৯৪১, ২১ জুলাই) এবং তারপর ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠিত হয় এবং দেশজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়, এসবেরই মুখপত্র হয়ে উঠেছিল জনযুদ্ধ পত্রিকা। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিরও একটি মুখপত্র প্রকাশিত হয় পিপলস ওয়ার নাম দিয়ে, সম্পাদক ছিলেন পি সি যোশী।

সংবাদপত্র হিসাবে জনযুদ্ধ সেদিন এক অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিল। সেই সময়ে ছিল তিনটি প্রধান ঘটনা: জার্মনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের লড়াই, জাপানের বিরুদ্ধে এদেশের কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসিদের প্রতিবাদ, এবং ব্যাপক খাদ্য সঙ্কট। এই তিন ঘটনার প্ররিপ্রেক্ষিতে যে তিনটি কর্মসূচী সেদিন গৃহীত হয়েছিল তা হলো, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা তুলে ধরা, জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষকে সতর্ক করা এবং খাদ্যের দাবিতে ব্যাপক জনমত গঠন করা। এই তিনটি কাজেরই সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিল জনযুদ্ধ।

যেমন ১: ২৫ নভেম্বরের জনযুদ্ধে সোভিয়েত সেনানায়ক জেনারেল তিমোশেঙ্কোর একটি ছবি সহ খবর লেখা হলো: লাল ফৌজের বিরাট পাল্টা আক্রমণ। মূল খবর: এইবার লালফৌজের বিরাট পাল্টা আক্রমণ সুরু হইয়াছে। স্টালিনগ্রাদের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক হইতে লালফৌজ জার্মানদের হটাইয়া দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। স্টালিনগ্রাদের একশত মাইল উত্তর পশ্চিমে ডনের পশ্চিম কূলে সারাফিমোভিচের ২০ মাইল ও স্টালিনগ্রাদের দক্ষিণে ১৫ মাইল শত্রু ব্যূহ ভেদ করিয়া লালফৌজ প্রায় ৫০ মাইল আগাইয়াছে। ...এই অভিযানের ফলে নাৎসীদের ৩টি পদাতিক বাহিনী ও ১টি ট্যাঙ্ক বাহিনী সম্পূর্ণ পালাইয়া গিয়াছে, ৭টি পদাতিক বাহিনী অসম্ভব রকম ঘায়েল হইয়াছে। ৩ দিনে ১৩ হাজার নাৎসী বন্দী হইয়াছে, ১৯ হাজার মারা গিয়াছে। গোটা স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মানদের ১ লাখ সৈন্য হত, ১ হাজার বিমান ও ৮ শত ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে।

যেমন ২: কলকাতায় জাপানের ষষ্ঠ বোমাবর্ষণ ঘটে ১৯৪৩ সালের ১৫ জানুয়ারি। এই সপ্তাহের জনযুদ্ধে এই পরিপ্রেক্ষিতে বোমার আঘাতে কুঁড়ে ঘর ধ্বংসের ছবি ছাপিয়ে, কয়েকজন কুলি মারা গেছেন—সরকারের এই

রিপোর্টের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়: বাংলার মজুর! নতুন আঘাত রোখো! জাপানী বোমাই হোক, আর মালিক বা আমলাতন্ত্রের আক্রমণই হোক, বাংলার বীর মজুর এ সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি রাখে। সেই সঙ্গে বড় বড় হরফে লেখা হয়: জাপানী বোমা গরীবের কুঁড়েই ভাঙ্গে, খড়ের গাদায় আগুন জ্বালায়। আর আমলাতন্ত্র বলে সামান্য 'কুলী' মরিয়াছে! যাহারা তাহার ঘর ভাঙ্গিয়াছে, আগুন জ্বালিয়াছে বাংলার চাষী মজুর তাহাদের ক্ষমা করিবে না। চাষী-মজুরই বোমার জবাব দিবে। আমলাতন্ত্রের তাচ্ছিল্য চূর্ণ করিবে। মালিকদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করিবে।

যেমন ৩: খাদ্য সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি জেলায় জেলায় সর্বদলীয় কমিটি গঠনের ডাক দেয়। মহিলাদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় আত্মরক্ষা সমিতি। তাঁরাও রাস্তায় নামেন। জনযুদ্ধ এই সময়ে স্লোগান তোলে: কয়লা চাই বস্ত্র চাই খাদ্য চাই রেজকি চাই। গোপাল হালদার এই সময়ে জনযুদ্ধে লেখেন: পাটের দর ১৫ টাকা মণ বেঁধে দাও। পাট কেনার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, হাটে-বাজারে সরকারী গুদাম করতে হবে। পাটের জমির চার আনার বেশি জমিতে পাট দেবেন না। বাকি পাটের জমিতে ধান চাষ করুন, খেয়ে বাঁচার পথ ধরুন। ২৮ এপ্রিলের জনযুদ্ধে আবদুল্লাহ রসুল লিখলেন: রাজনীতিতে বাংলার কৃষকদের এগিয়ে আসতে হবে।...দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সঙ্কট—ভাত কাপড়ের সঙ্কট কৃষক সমাজকে জেরবার করে ফেলেছে। দেশময় হাহাকার।...লুটপাট নয়, সংগঠিত সম্মিলিত আন্দোলনের পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সঙ্কট সমাধান করতে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। ৪৩ সালের খাদ্য সঙ্কট ক্রমেই গুরুতর চেহারা নিতে থাকে। তখন জনযুদ্ধ পত্রিকার উদ্যোগেই একটি আবেদন প্রকাশ করা হয়: ক্ষুধিতের সেবায় সাহায্য করুন। মৃত প্রায় নরনারীকে বাঁচান। এই আবেদনে সই করেন: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমানের মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজা, সৈয়দ নওশের আলি, ইন্দিরা দেবী, যতীন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশ, জসিমুদ্দীন আহম্মদ, ডাঃ বি সি ঘোষ, ডাঃ আর আহমদ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সাতকড়িপতি রায়, বুদ্ধদেব বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বঙ্কিম মুখার্জী, জীবনলাল পণ্ডিত, লীলা মজুমদার, মোহিনী দেবী, জাস্টিস এ এন সেন, জে

সি গুপ্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই পরে একটি সভা থেকে গঠিত হয় পিপলস রিলিফ কমিটি, যে-কমিটি ৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির এই সময়ের নীতি ছিল : বৃটিশের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবি তোলা, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করা (জনযুদ্ধ, ২২ মার্চ ১৯৪৪)। এই পরিপ্রেক্ষিতে জনযুদ্ধ প্রায় নিয়মিতভাবেই প্রকাশ করে গান্ধী, জওহরলাল, মৌলানা আকরম খাঁ, লিয়াকৎ আলি প্রমুখের বক্তব্য বিবৃতি ও ভাষণ।

কমিউনিস্ট পার্টির এই সময়ের নীতি এবং জনযুদ্ধ পত্রিকার ভূমিকা একটি জায়গায় এসে পরবর্তীকালে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তা হলো, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিযান এবং জাপানের আক্রমণকে সমার্থক করে দেখা এবং সেভাবে প্রচার চালানো। যদিও পরবর্তীকালে বেশ কিছু কমিউনিস্ট নেতাই একে 'ভ্রান্তি' বলে মেনে নিয়েছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন সম্প্রতিকালে নতুন করে সুভাষচন্দ্র ও এই পর্বের মূল্যায়ন শুরু করেছে।

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে পিপলস ওয়ার পত্রিকার নাম পাল্টে করা হয় পিপলস এজ এবং জনযুদ্ধ পত্রিকা দৈনিকে রূপান্তরিত হয় নতুন নামে, স্বাধীনতা। এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ ছিল সম্ভবত এটাই যে বের্লিনে সোভিয়েত পতাকা ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনযুদ্ধের কাল শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী যে কাজ এসে হাজির হয় তা পূর্ণ অর্থেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা। স্বাধীনতা পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী।

সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন সংগঠিত করার যে ভূমিকা জনযুদ্ধ নিয়েছিল, স্বাধীনতা পত্রিকা ছিল তারই সম্প্রসারিত রূপ। দৈনিক কাগজ, নিত্য দিনের সংবাদের কাগজ, কিন্তু সমাজ অবলোকনে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এর আগে এরকম কোনো দৃষ্টান্ত এদেশে ছিল না। ১৯৪৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তমলুক তথা সমগ্র মেদিনীপুরের কৃষকদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে স্বাধীনতা সম্পাদকীয় লেখে : তমলুকের

কৃষককে বাঁচান। নিবন্ধে লেখা হয়: সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আজ তমলুক তথা মেদিনীপুরের উপর। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী এখন তমলুক মহকুমার মহিষাদলে সশরীরে উপস্থিত। অল্প কিছুদিন আগেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের বিবৃতিতে এই তমলুকবাসীর উপর আমলাতন্ত্রের আক্রমণের জঘন্য কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের জ্বলন্ত মশাল হাতে এই তমলুকের মানুষ অমানুষিক অত্যাচারের মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছে। গুলির চোটে মারা গিয়াছে ৪১ জন মেয়ে-পুরুষ, ৭৩ জন স্ত্রীলোক ধর্ষিতা হইয়াছেন, বাড়ী এবং গ্রামও জ্বলিয়াছে অনেক অনেক। মারধোর লুঠতরাজ, গ্রেপ্তার ও জেল তো কতই হইয়াছে। ইহার উপর আবার ঝড় প্লাবনের দারুণ ধ্বংসলীলা। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক এবং অন্যান্য অনেকের রিপোর্ট হইতেছে দেশবাসী সকলেরই জানিবার ইচ্ছা হয়,—বীরত্ব ও আত্মত্যাগের গরিমায় উজ্জ্বল এই তমলুকের মানুষেরা আজ কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে, কি তাহাদের দুঃখ কষ্ট, কিই বা তাহাদের দাবী? দমননীতির দারুণ আঘাত এবং ঝড় প্লাবনের ক্ষতি কাটাইয়া যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা কি চায়? সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানিবার জন্য তাহারা আজ কিভাবে প্রস্তুত হইতেছে? কংগ্রেস সম্পাদকের রিপোর্টে বা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত অন্যান্য রিপোর্টে তমলুকের এই জীবন্ত মানুষের কোন সন্ধান মেলে না। সংগঠিত কৃষক আন্দোলন তমলুকের কৃষকগণকে বাঁচিবার একমাত্র পথে চলিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। ১৯৪৩ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বাকী বকেয়া খাজনা, দেনা, সরকারী ঋণ, জোতদারের বাড়, সমস্ত কিছুর আদায় স্থগিত রাখিতে হইবে। নূতন বছরে সরকার কর্তৃক ব্যাপক-ভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা চাই। কোনও রকম বাকী পাওনা আদায়ের জন্য এই দুর্বৎসরে চাষীর ঘর হইতে ধান নেওয়া চলিবে না। তমলুকের মানুষের উপর একটার পর একটা চোট আসিয়াছে,—দমননীতি,—প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্রসঙ্কট এবং হাল সনের ঘাটতি ফসল। সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যদি কংগ্রেস হাত মিলান, তাহা হইলে তমলুক বাঁচিবে। তমলুকের জোতদার এবং জমিদারেরা কংগ্রেসেরই সমর্থক এবং অনেকেই কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা। কংগ্রেস আহ্বান করিলে তাঁহারা হাল সনে

আদায় নিশ্চয়ই স্থগিত রাখিবেন। ইহাই হইবে সাম্রাজ্যবাদের দমননীতির সত্যকার জবাব। সাম্রাজ্যবাদ তমলুকের মানুষের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিতে চাহিয়াছিল। সেই তমলুক আবার উঠিবে, সংঘবদ্ধভাবে আবার চরম আঘাত হানিবার জন্ত প্রস্তুত হইবে। মহাত্মা গান্ধী বর্তমান তমলুক ভ্রমণের সময় নিশ্চয়ই তিনি কংগ্রেস-সমর্থক জোতদার এবং জমিদারদের এই দেশপ্রেমিক কর্তব্য বুঝাইয়া দিবেন।

২৬ জানুয়ারি তারিখটি অনেক আগেই ঘোষিত হয়েছিল স্বাধীনতা দিবস হিসেবে। ২৬ জানুয়ারির এই সংখ্যায় স্বাধীনতা পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় লেখা হয় তা সব দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়: আজ স্বাধীনতা দিবস। ভারতবর্ষের মানুষ আজ সহরে গ্রামে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিবে; স্বাধীনতার নামে নিজেদের নূতন করিয়া উৎসর্গ করিবে। স্বাধীনতার পিপাসা আজ দেশের সকল মানুষকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। এ পিপাসা নূতন নয়, সাময়িকও নয়। একশো বছর ধরিয়া এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই লক্ষে লক্ষে আজ দেশের নরনারী সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে স্বাধীনতার সৈনিকদের, স্বাধীনতার সংগ্রামশীল পথকে, বিদ্রোহী আদর্শকে। স্বাধীনতাই আজ দেশের মানুষকে পাগল করিয়াছে, তাহারা স্বাধীনতার কোনো একটি সঙ্কীর্ণ দলগত আদর্শ বা বিশিষ্ট পদ্ধতিকে একান্ত বলিয়া মানে নাই, মানেও না। এই কথা, তাহারা জানে, এই স্বাধীনতার আদর্শ জন্ম লইয়াছিল কংগ্রেসের বাহিরে, ফুটিয়া উঠিয়াছে কংগ্রেসের মধ্যে; আবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে কংগ্রেসের সীমা ছাড়াইয়া দেশের সকল মানুষের বুকে। ইহার স্বপ্নে তাই উন্মাদ হইয়া বলি দিয়াছে মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণী, ইহার আহ্বানে তাই ছুটিয়া পথে বাহির হইয়াছে দূর গ্রামের কৃষক, দূরান্তরের জাতি-উপজাতির সরল মানুষ, আর লাল ঝাণ্ডার ডাকে উদ্বুদ্ধ সরল সচেতন মানুষ। স্বাধীনতার সংগ্রামে মিশাইতে আসিয়াছে তাহাদের রক্ত, মিশাইতে আসিয়াছে তাহাদের পতাকা। কোনো দল, কোনো সংগঠনের ভেদ-রেখা টানিয়া আজ যাহারা স্বাধীনতার এই অসংখ্য সৈনিককে বিভক্ত করিবে তাহারা স্বাধীনতার সংগ্রাম বিনষ্ট করিবে, স্বাধীনতার সঙ্কল্প করিবে অস্বীকার। অথচ উনিশশো ছেচল্লিশের ছাব্বিশে জানুয়ারী আজ এক মহামুহূর্ত ইতিহাসের, কে না জানে, দেশ বিদেশে আজ সাম্রাজ্যবাদের আসন টলটলায়মান। সমস্ত মুক্তিকামী মানুষ আমাদের ৪০

কোটি মানুষের মুক্তি প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব, মহাযুদ্ধের বিপ্লবী সম্ভাবনা মুক্তির ডাক লইয়া সকল দেশের দুয়ারে হাঁকিয়া যাইতেছে। ইতিহাসের এই আহ্বানকে এই মুহূর্তে গ্রহণ করিতে পারিলে পরাধীন ভারতে আমাদের স্বাধীনতার সঙ্কল্প আর কোনদিন গ্রহণ করিতে হইবে না—স্বাধীন ভারতে আমরা সূচিত করিতে পারিব আমাদের স্বাধীন জীবন। অথচ জানি না, না-জানিয়া আজ সে মহৎ সম্ভাবনাকেও আমরা অস্বীকার করিয়া ফেলিতে পারি। স্বাধীনতার এতদিনকার যুদ্ধ আজ নিজেদের ভুলে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বেও পরিণত হইতে পারে। কলিকাতায়, চট্টগ্রামে যে শুভ সূচনা দেখা গিয়াছে—কলিকাতায়, বোম্বাইতে ও বহু বহু স্থলে আবার তাহারই বিস্মৃতি ও বিকৃতি দেখা দিয়াছে—স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রও আজ গোপনে, প্রকাশ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই আত্মঘাতের প্ররোচনাকে আজ এই দিবসে অস্বীকার করিতে হইবে দেশবাসীর, এই গৃহযুদ্ধের ষড়যন্ত্রকে ঠেকাইতে হইবে জনগণের—না হইলে উনিশশো ছ'চল্লিশ শুধু পরাধীন ভারতের আত্মঘাত ও রক্তপায়ী দেখিবে—স্বাধীনতার সৈনিকেরা হইবে বিধ্বস্ত, স্বাধীনতার সঙ্কল্প হইবে ব্যর্থ, জাতি হইবে প্রবঞ্চিত।

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা পত্রিকাও বন্ধ হয়ে যায়। এরপরতা ফের প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে, চলে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। ওই বছরে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ করে দৈনিক কালান্তর। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) ১৯৬৭ সালে প্রকাশ করে সান্ধ্য দৈনিক গণশক্তি। পরে তা প্রভাতী দৈনিক হয়।

পুনশ্চ

চল্লিশের দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং মেদিনীপুরের তমলুকে স্বাধীন সরকার গঠন। আমরা আগেই দেখেছি প্রবাসে প্রথম স্বাধীন ভারত সরকার গঠিত হয় কাবুলে (মহেন্দ্র প্রতাপ ওবায়দুল্লাহ প্রমুখের নেতৃত্বে)। তারপর দ্বিতীয় স্বাধীন সরকার গঠন করেন সুভাষচন্দ্র বসু, জাপানে। কিন্তু ভারতের মাটিতে সরাসরি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছিল তমলুকেই, যার পেছনে ছিল রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের

মুখপত্র হয়ে উঠেছিল বিপ্লবী পত্রিকা। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার নামে ওই স্বাধীন সরকারই এই পত্রিকা প্রকাশ করতেন। স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিল বিপ্লবী পত্রিকাই। স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২ সালের ১৭ ডিসেম্বর।

১৯৪৩ সালের ২৬ জানুয়ারি সংখ্যায় বিপ্লবী পত্রিকা 'স্বাধীন তাম্রলিপ্তে জাতীয় শাসনব্যবস্থা'—এই শিরোনামে লেখে : পৌনে দুইশত বছরের ইংরাজ শাসন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কৃষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক ধ্বংস সাধন করেছে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, মনুষ্যত্বে সব দিক দিয়ে ভারতের ··সাধন করেছে। তাই এই অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত বিদেশী দুঃশাসনকে ধ্বংস করাই প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য ও ধর্ম। শত···বৎসর ধরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেস) এই চেষ্টা করে আসছে। এই বারে স্বাধীনতার এই শেষ যুদ্ধ চলেছে। এই যুদ্ধে হয় বিজয় নয় মরণ। হাজার হাজার বৎসরের কৃষ্টি ও সভ্যতার লীলাভূমি ভারত কখনও মরতে পারে না। তাই বিজয় এবারে সুনিশ্চিত, এখনও ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে নি বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে স্বাধীন রাষ্ট্র দানা বেঁধে উঠেছে। এইগুলির বিস্তার ও মিলনেই স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র গড়ে উঠবে। মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহকুমায় বীর অধিবাসীদের ২৯শে সেপ্টেম্বরের (১৯৪২) একটিমাত্র প্রচণ্ড আঘাতে এই মহকুমায় বৃটিশ রাজের পরম আরামের সুখ-শাসন তাসের ঘরের মত মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে পড়েছে। এখন থেকে চলেছে অস্ত্রেশস্ত্রে ও সৈন্য সামন্তে সুরক্ষিত কয়েকটিমাত্র ছোট ছোট ঘাঁটি থেকে পল্লী অঞ্চলে বৃটিশ পশুর অবাঞ্ছনীয় অত্যাচার। এইভাবে তমলুক মহকুমা সম্প্রতি এমন এক অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছিল যে ঐ রকম চরম অরাজক মগের মুল্লুক অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। তাই মহাকুমা কংগ্রেস শুভ ১লা পৌষ (১৭.১২।৪২) থেকে মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত "তাম্রলিপ্ত মহাকুমা জাতীয় শাসনব্যবস্থা" সংক্ষেপে "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার" প্রবর্ত্তন করেছে। ভাবী মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনের সঙ্কল্প নিয়ে বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য পুনর্ব্যবস্থা না পর্য্যন্ত একজন "সর্ব্বাধিনায়কের" ওপর জাতীয় শাসনের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। তিনি তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে নিয়ে শাসন চালাচ্ছেন। ঠিক এইভাবে ২৬শে জানুয়ারী (১৯৪৩) "স্বাধীনতা

দিবসে" (১২ই মাঘ ১৩৪৯) নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, সুতাহাটা ও তমলুক থানায় এক একজন অধিনায়কের উপর মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে নিয়ে "থানা জাতীয় সরকার" চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে। আশা ও বিশ্বাস করি তমলুক মহকুমাবাসী তাহাদেরই "জাতীয় সরকারকে" শক্তি, সমর্থন, অর্থ ও আনুগত্য দিয়ে এই মহকুমা থেকে বৃটিশ শাসনের সকল চিহ্ন একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলে পূর্ণ নবযুগের প্রবর্ত্তন করবে। হয় জয় নয় মৃত্যু, বন্দেমাতরম।

ওই সংখ্যাতেই 'তমলুকে জাতীয় সৈন্যবাহিনী' শিরোনামে বিপ্লবী পত্রিকা জানায়: বিদেশী শত্রুর ইংরাজ শাসন সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া স্বাধীন তমলুকে গণতান্ত্রিক সুশাসন চালাইবার জন্য (১লা পৌষ ১৩৪৯, ১৭।১১।৪২) হইতে যে 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠিত হইয়া...ভারতীয় "স্বাধীনতা দিবসের" শুভ দিনে (২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৩, ১২ই মাঘ, ১৩৪৯) শুরু করা হইয়াছে—তাহাদের সকলতার মূলে ছিল, তমলুক মহকুমাবাসীদের সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ। এই বীরবৃন্দকে সংঘবদ্ধ করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত করিয়াছিল... মহকুমার সুশিক্ষিত কর্মীগণ। এই দেশ সেবকদলের অগ্রণী ছিল "বিদ্যুৎ-বাহিনী।" আজ এই স্বাধীনতা দিবসে (২৬শে জানুয়ারী—১৯৪৩) সেই বিদ্যুৎবাহিনীকে সমগ্র মহকুমায় "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের দলে · ...করা হইল। সর্বাধিনায়ক।[২৬]

সংযোজন

১. উনবিংশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রের পেছনে যে-চেতনা কাজ করেছিল তা প্রধানত ছিল ধর্ম ও জাতি-নির্ভর। এই শতকের দ্বিতীয় ভাগে এসে ইংরেজের অত্যাচারের কারণে তার মধ্যে দেখা দেয় দেশপ্রেম। পশ্চিমী ভাবনা-চিন্তার আলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা দেয় সংস্কারবাদী উদ্যোগ। এই সময়ের সংবাদপত্রের দেশপ্রেমিক ভূমিকার পেছনেও ছিল ধর্মীয় চেতনা, ইংরেজকে বিজাতি এবং ম্লেচ্ছ বলে মনে করার কারণে।

২. ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন এবং রাশিয়ার বিপ্লব প্রয়াস এদেশের রাজনীতিতে আনে জঙ্গী আন্দোলনের ঢেউ। সমাজতন্ত্রের কথা উচ্চারিত হতে থাকে। সংবাদপত্র এই সময়ে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীর ভূমিকা নেয়।

৩. ১৯১৭ সালের রুশ মহাবিপ্লব এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে সংযোজন করে এক নতুন মাত্রা। কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়; সাম্যবাদের আদর্শে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। ইতিপূর্বের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আবছা ধারণা স্পষ্টতর রূপ পায়। বাংলা সংবাদপত্রের জগতে দেখা দেয় বিভাজন। কিছু কিছু সংবাদপত্র সরাসরি বিপ্লবী আদর্শের মুখপত্র হয়ে ওঠে, আর একটি গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রের ছায়ায় জাতীয়তাবাদী চেহারা নিয়েই থাকে। তৃতীয় একটি গোষ্ঠীর বিষয় হয় হালকা দেশপ্রেম ও নিজস্ব ভাবনার প্রচার।

৪. স্বাধীনতা-উত্তরকালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোষ্ঠী এক হয়ে বৃহৎ ব্যবসা-নির্ভর সংবাদপত্রের জগৎ তৈরি করে।

৫. রুশ মহাবিপ্লব বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তর ঘটায় সাতটি কারণে। প্রথমত, মার্ক্সীয় বিপ্লবের আদর্শে উদ্দীপিত কাগজের জন্ম দেয়। দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্রকে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যায়। তৃতীয়ত, সংবাদপত্রে এই সব মানুষকে জায়গা করে দেয়। চতুর্থত, সংবাদপত্রে একটি নতুন ধারা বা স্কুলিং-এর প্রবর্তন করে। পঞ্চমত, সংবাদপত্রকে স্বতন্ত্র একটি সাংগঠনিক ভূমিকা নিতে বাধ্য করে। ষষ্ঠত, বাংলা সংবাদপত্রে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী প্রকাশের দরজা খুলে দেয়। সপ্তমত, বাংলা সংবাদপত্রে শুধু ভাষাগত নয়, সংবাদ সংগ্রহ ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও আনে চূড়ান্ত সত্য-নির্ভর প্রয়াস। সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলে সাধারণকে মানুষের।

৬, রুশ মহাবিপ্লব প্রমাণ করে দেয়, সমাজে প্রতিনিয়ত যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব চলছে, সংবাদপত্র তার হাত থেকে রেহাই পায় না। কিছু সংবাদপত্র মানুষের জন্য লড়াই করে সর্বস্ব দিয়ে, কিছু সংবাদপত্র মানুষের জন্য লড়াইয়ের নামে সর্বস্ব সংগ্রহ করে। কিছু সংবাদপত্র মেহনতী মানুষের জন্য, বাকিগুলি, এবং অধিকাংশই বুর্জোয়াদের মুখপত্র।

নির্দেশিকা

১। তারাপদ পাল : ভারতের সংবাদপত্র।

২। কার্ল মার্ক্স : ভারতে জুলুমের তদন্ত। মার্ক্স-এঙ্গেলস : প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ।

৩। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক)।

৪। দিলীপ মজুমদার : হরিশ মুখার্জি : জীবন ও ভাবনা।

৫। টমাস লো : Central India during the Rebellion of 1857-58.

৬। দিলীপ মজুমদার।

৭। Selections from writings of Hurrish Chunder Mookerji.

৮। ঐ

৯। ঐ

১০। ঐ

১১। দিলীপ মজুমদার।

১২। Selections from the writings.

১৩। ঐ

১৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাময়িকপত্র, প্রথম খণ্ড

১৫। ঐ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

১৬। চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী

১৭। ঐ

১৮। ঐ

১৯। ঐ

২০। সুকোমল সেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস।

২১। ঐ

২২। চিন্মোহন সেহানবীশ।

২৩। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাসিতের আত্মকথা।

২৪। James Campbell Ker : Political Troub'e in India.

২৫। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি।

২৬। Jitendra Nath Basu, Romance of Indian Journalism.

২৭। James Campbell Ker.

২৮। Jitendra Nath Basu.

২৯। তারাপদ পাল।

৩০। A Short History of the USSR, Vol. I, Moscow.

৩১। চিন্মোহন সেহানবীশ, পরিচয়, বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১-২।

৩২। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্রপত্রিকা।

৩৩। ঐ, বিজলী, ৪র্থ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা (১৩ ভাদ্র ১৩৩১) থেকে উদ্ধৃত।

৩৪। ঐ

৩৫। পরিচয়, বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১-২।

৩৬। মলয় বসু, অক্টোবর বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য।

৩৭। ঐ

৩৮। চিন্মোহন সেহানবীশ, পরিচয়, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ১০-১২।

৩৯। পরিচয়, আগের উল্লেখ করা দুটি সংখ্যা এবং অবিনাশ দাশগুপ্তর লেনিন, রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদসাহিত্য।